ISSN : 2350-0433

সপ্তান্বয়ী

চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ২০১৭ ₹৪০

Saptannoyi

A Literary Serial Publication

Volume–IV, Issue – 1, Cumulative Issue – IV, Year – 2017

Owner : Dr. S. Bhattacharya

Chief Editor : Mr. Niloy Maity

Published by the Saptannoyi Editorial Board in January 2017

1/1 Shyamasree Pally Main Road, Nona Chandanpukur, Barrackpore, Kolkata – 700122

ISSN : 2350-0433

Saptannoyi is an annual bi-lingual literary serial publication that publishes original works in both Bangali and English and strives to influence its readers and enthusiasts in a wide domain.

This magazine is sold subject to the condition that it shall not, by the way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchasers. The works that are published in the magazine are the intellectual properties of the respective contributing authors and artists.

Contact No. : +91-7278104787/ +91-8016276250

E-mail : saptannoyi@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/saptannoyi

Twitter : www.twitter.com/saptannoyi

Composition : Bhashalipi, 24 Raja Lane, College Row, Kolkata-700009

Printing : Mudran Graphics, 24 Raja Lane, College Row, Kolkata-700009

সম্পাদকীয়

চার নম্বর ও ট্যারট কার্ডস্

সপ্তান্বয়ীর চার নম্বর বছর। অনেক রঙের কালি আর সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলা গেল বইমেলা সংখ্যাটি। ছোট। বড়। মাঝারি। কর্পোরেট। আমরা বিশ্বাস করি এগুলি বইমেলার স্টলের মাপকাঠি হতে পারে, পত্রিকার নয়। সপ্তান্বয়ীর পাতায় দুটি ভাষার লেখা যেমন মিশবে, তেমনি কিছু আঁকা থাকবে রাখা। এমন সময়ে এই সংখ্যাটি পাঠকদের হাতে পৌঁছোবে, তখন চারপাশে শীতের আমেজ। মিলনমেলা প্রাঙ্গণে মানুষ ভীড় করে আসছে, ছড়িয়ে রয়েছে গাদা লিফলেট আর বইমেলার গান। লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে হবে আড্ডা, লেবুচা, আর পরিচয়ের পর্ব। আগের বছর কে যেন লিখেছিলেন, এ হল আমাদের দুগ্গাপুজো।

বার্ষিক এই ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা নিজের মতন করে উৎসবে সামিল আর সেখানে সপ্তান্বয়ী শখের পত্রিকা হয়ে আসেনি। কবিতায় ছন্দ : পছন্দ বা অপছন্দ, আধুনিক ফর্ম সব নিয়েই কিছু লেখা যেগুলো কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে তারা রইল জানলার পাশে। তেমনি রইল ছোটগল্প আর বলিষ্ঠ কিছু প্রবন্ধ।

এই মলাট তার পাঠকদের বলতেই পারে—ভবিষ্যৎ কি হবে সব বলতে পারিনে বাপু—তবে যাঁরা এই সংখ্যায় লিখেছেন তাদের ক'জন বাংলা সাহিত্যে একদিন নিশ্চিত রাজত্বের অধিকারী হবেন। স্বাদবদলে পাওনা রইল ইংরেজির ক'টি লেখাও। কলকাতার সমস্ত বেগুনী আলোর দিব্যি—যারা এই লাইন ক'টি পড়ে ফেলেছেন তাদের জন্য আমরা সুগন্ধী রবার, ভেজা রাস্তা আর আবেগ রেখে দিলাম।

ভালো থাকুন।

শুরুয়াৎ কিয়া যায়ে জনাব?

—নিলয়
মুখ্য সম্পাদক
সপ্তান্বয়ী

EDITORIAL BOARD

Sl. No.	*Name*	*Designation*
01	Mr. Niloy Maity	Chief Editor
02	Mr. Sourin Bhattacharya	Assistant Editor
03	Mr. Soham Banerjee	Additional Editor
04	Mr. Sanjib Majumder	Treasurer
05	Mr. Sudipta Majumder	Features Editor
06	Mrs. Manika Datta	Proof Reader
07	Mr. Subrata Mukherjee	Advertising Executive
08	Mr. Mrinmoy Chowdhury	Analyst

সূ চি প ত্র

কবিতাপর্ব ১ :

আদিদেব মুখোপাধ্যায়, জুবিন ঘোষ, শুভম চক্রবর্তী, মেঘনা চক্রবর্তী, শুভ আঢ্য, রুমা ঢ্যাং, চন্দন কিশোর, সৌরিন ভট্টাচার্য, মৃন্ময় চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ শাসমল

কথা ও কাহিনী :

সায়ন্তনী নাগ, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, অ্যাঞ্জেলিকা ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, সুমিতা মুখোপাধ্যায়, অরুনাংশু চ্যাটার্জী, অয়ন দাস, সুনৃতা মাইতি

English Poems :

Sudipta Biswas, Manika Datta, Arunima Chowdhury, Niloy, Anindita Bose,

English Stories :

Sarmistha Ghosh, Biswajit Ganguly

কবিতাপর্ব ২ :

অরুণিমা চৌধুরী, মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী, বিকাশ সরকার, মণিকা দত্ত, মোঃ জাওয়াদুর রহমান, তপন এম চিশতী, জয়দীপ চক্রবর্তী, রিমি মুৎসুদ্দি, যশপাল সিং, তন্ময় ভট্টাচার্য

প্রবন্ধপর্ব :

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃন্ময় চৌধুরী, শুক্লা মজুমদার

Essays :

Sourin Bhattacharya, Jayasree Roy

Illustrations :

Sourav Mitra, Utpala Kundu Sen, Mistu Dey, Ruma Dhang, Aparajita Roy

দুটি কবিতা

আদিদেব মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বর নামক জেলে

ঈশ্বর নামে এক জেলে ছিল।
একবার মাছ ধরে সে ফিরছে,
পথে কয়েকটা কামট মাছটাকে
কামড়ে খেয়ে নেয়। ঈশ্বর তীরে এসে
নৌকাটি বাঁধে।

মাস্তুল পিঠে নিয়ে ঈশ্বর একটু কুঁজো হয়ে হেঁটেছিল।
তার অবসন্ন দেহ বিশ্রামের জন্য
ভেঙে আসতে চায়।

ঘরে ফিরে ঈশ্বর দুয়ার ভেজিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে
শুয়ে পড়ে
আর শোওয়ামাত্রই তার ঘুম এসে যায়।

জেলেদের কেউ কেউ মাছটাকে দেখেছিল
মোহনায় দোল খাচ্ছিল সেই মাছের শিরদাঁড়া।

'কী সুন্দর লেজা', একজন মুগ্ধভাবে বলে।
তারা মাছ দেখেছিল। দ্যাখেনি, ঈশ্বরের
উভয় তালুতে ছিল
পেরেকের দাগ।

২৬ মে, ২০১৬

উৎসর্গ : আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

স্বাতী নক্ষত্রের জল

দেখেছি ধূসর নদী। শাদা করোটির বিবরে বিষণ্ণ
ভিজে দাগ—তাও দেখা আছে। আপাততঃ, সায়ংকাল,
গন্ধভেদালির ঝোপে আমি লুকিয়ে, দেখেছি সবুজ অন্ধকারে
জলজ উদ্ভিদ। দীর্ঘক্ষণ আমি চেয়ে আছি, জ্যোৎস্না
নেই, বদলে কী ভীষণ অন্ধকার এখানে! রাত্রি ঘনতর
হয়, হতে থাকে।...নক্ষত্রজল, আয়। স্তব্ধ পৃথিবী, বাঁশপাতা,
জোনাকির পেট, স্তব্ধ ধানের খেত, এসব জুড়াতে
আয়। আমি অপেক্ষমান, আমি ভয় পেয়েছি খুব। অন্ধকারে
শ্যাওলাধরা ঘাট, কে যেন আসছে, কে যেন স্নাত হয়ে
উঠে এল। ভিজে শাড়ি, আমি শীর্ণবুকে উপুড় হয়ে দেখি
তার স্তনে লেপ্টে আছে জল, বস্ত্র গেছে খসে। আমি দেখছি,
শ্বাস বন্ধ করে। তার কালচে উদর, স্ফীত, গর্ভবতী
সে ফোঁপায় অদূরে। শুনেছি তার ধ্বনি। অস্পষ্ট সুরে সে গোঙায়।
বুকে ঘাস চেপে আমি দেখেছি তাহারে। দেখেছি ধূসর নদী, শাদা
করোটিবিবরে বিষণ্ণ ভিজে দাগ, দ্যাখা আছে তাও
দ্যাখা আছে জলজ উদ্ভিদ, সবুজ অন্ধকারে। জুড়াতে এসব
নক্ষত্রজল, আয়।।

গণ্ডার

জুবিন ঘোষ

হরিণ আদর করে যতবার সিদ্ধি পেতে যাই
দেখি মায়ামৃগ থেকে গণ্ডার হয়ে গেছ।
আমার তো বেশ লেগেছে, হ্যাঁ এর মধ্যে বিকট হাঁ
উল্টে আমিও শার্দুল হয়ে গেছি; সিদ্ধিজাত।
এলাম, মুক্তি দেখলাম, জয় করতে মৃগয়া
চলে গেলাম আবার। এবার আর ব্যর্থ না,
যথার্থ তেজস্বী হরিণ শিকার করে আনব

দূর থেকে দেখলাম ঋষ্য তৃণভূমি, দূর থেকে শরব্য স্থির—
জ্যা-মোচন করতেই দেখি স্ত্রীআচারে নিবেদিত তিরগুলি
একটাও বসছে না, মখমল খসে পড়ছে। কী আশ্চর্য!
যতবার আমি চোরাশিকারি হতে চাই, হে আর্য,
কিছুতেই বুঝে উঠতে পাই না, ঠিক তির বিঁধবার
আগেই নাক উঁচু করে তুমি কীভাবে প্রতিবার
কৃষ্ণসার হরিণ থেকে অপরূপ গণ্ডার হয়ে যাচ্ছ!

তিনটি কবিতা

শুভম চক্রবর্তী

নদী

যে নদীটির সরলরৈখিকতা আমাকে অবাক করত, তার ডাকনাম ছিলো আঁকাবাঁকা...
আর পরস্পর জাপটে থাকার মুহূর্তে বিদ্যুৎলতার পাতা তিরতির করে যেতো
এ সমস্তই আমি ভেবেছিলাম এবং মেখেছিলাম
চারকোটি চল্লিশলক্ষ মাখামাখি পেরিয়ে আমার মনে হয়েছিল—
পাখিদের পালকে তৃষ্ণা গলে নামলে চোখ বন্ধ করতে হয়
নাহলে আগ্নেয় ওড়নার পাকে জড়িয়ে যেতে পারে কুড়িয়ে পাওয়া দুঃস্বপ্ন
সেই দুঃস্বপ্নের ভেতর অদ্ভুত প্রাসঙ্গিকতায় ডানা মেলে থাকে জগৎসংসার
হে সরলরৈখিক তুমি কখনও বুঝলেই না চাওয়া ও পাওয়ার দুস্তর ব্যবধান
নদী হতে চেয়েছিলে, সানুদেশে ঝুলে আছে ডাকনামটুকু; আঁকাবাঁকা...

ছিন্নমস্তা

ছিন্নমস্তা দাও না সস্তা জিভের কুহক
লোল বদনে স্তন আচমনে কাঁপছে যুবক
মুদ্রা তোমার লুপ্ত খাদের সুপ্ত আঁধার
কসমিক রোদে বেহায়া পুলক পুড়ে ছারখার
তারুণ্যময় সেক্সিলুকের ধারাস্নানে
ছাত্রনেতার কাপড় খুলেছো প্রশ্নবাণে
হায় রে সন্ত লক্ষীমন্ত শিথিল লাজুক
অপাঙ্গ চিরে ঝুমুরের সুর ভাঁজছে ভাঁজুক
অন্নের পথে হেঁটে যাক একা লাউডগাটি
ছিন্নমস্তা হোক না সস্তা বিয়ার পার্টি
ছিন্নমস্তা তোমার শরীরে অকাল বোধন
উপেন চাইছে সাড়ে তিনহাত আর আমবন
ছিন্নমস্তা হৃদয়ে ফুটেছে রক্তপলাশ
কবন্ধময় পোয়াতি জমিনে শস্য ফলাস...

শরীর

হাড়ভাঙা ঘুম থেকে উঠেছে যাপন
কড়ি ও বর্গার সোঁদা গন্ধ মাখা রাত
সর্বত্র লেলিহান চিৎকৃত সুর
শবের কলমে লিখি অন্ত্যেষ্টি যাত্রা
বটগাছ ঝুরি নামে
ডানা কাঁপা ঝড়
ব্যথার মেঘ মানবজমিন ঘিরে ফেলে
ময়াল ও নিমদাঁতন নিত্য সঙ্গি করি
পিশাচ সাধনার নিকষ মোহ
তার কিছু শরীরেরা সাজিয়ে রেখেছে...

দুটি কবিতা

মেঘনা চক্রবর্তী

একটা নীরব মুহূর্ত

মনে দাগ কেটে যায় বাস-রিক্সার অতিরিক্ত শব্দেরা,
ভসভসে আবেগ বুকে নিয়ে
আমি পাহাড়ে হারিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে দিনেদুপুরে ভেসে যেতে থাকি...
কুড়িটা গল্প আর একটা কবিতা তুলে রাখা আলমারিতে,
প্রকাশকের চিঠির অপেক্ষার ক্লান্তিতে একটু চোখ বুজে বসে থাকে সময় ধরে তারা।
সেলফোন নিরুদ্দেশ,
হাঁটু-মুখ জড়িয়ে তাই চুপচাপ শুয়ে থাকি,
জানালা দিয়ে রাস্তা ধরে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া ফ্লাইওভার বোকার মতো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে
সঙ্গ দেওয়ার জন্যেই হয়তো....
শেষ না হওয়া অন্ধকার সিঁড়ির কোনে বসে,
লুকিয়ে রাখা ঠোঁটের স্বাদে বিশ্রাম খুঁজি...
ভোরের ঘুমে তোর গন্ধ পাবো বলেই
চুলখোলা কুয়াশাদের ভীড়েও,
একমাত্র নিজের ছায়ায় আত্মসমর্পণ করি... ॥

অপ্রকাশিত কথোপকথন

—তবে আপনি এখানেই বসেই থাকবেন তাই তো??
—হ্যাঁ,
—এই রোদে আপনি নড়বেন না এখান থেকে??
—উঁহু...
—বাড়িও যাবেন না???
—না তো...
—আমাকেও যেতে দেবেন না???
—না...
—আমি কে আপনার???
—জানি না...
—তবে আমি কেন আপনার সাথে বসে থাকবো??

—সেটা আপনার ইচ্ছে...

—আরে, রাগ হচ্ছে খুব...এরকম কথা কেন আপনার???

—এত রাগ, আমায় একটু ধার দেবেন?? অনেকদিন রাগ হয় না আমার...জানেন...

—উঠুন তো...

—জলের পাড়ে বসেও এতরাগ মনে আসা কিন্তু খুব ভালো ক্ষমতা, এসব সবার দ্বারা হয় না...
একটু শেখান না, রাগ করা আমায়, please...

—এই রোদের মধ্যে, জলের পাড়ে বসে আমার যেমন আপনার মতো নির্লিপ্তি আসছে না,
তেমনই আপনারও রাগ আসছে না আমার মতো...same same...

—নির্লিপ্তিটা আমার জন্মগত, রাগটাও বুঝি জন্মগত???

—অত জানি না...

—আরে, এত ছটফটানি কিসের আপনার?? ধৈর্য ধরুন, দেখুন এই এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে...জলের মাথায় ধোঁয়া ধোঁয়া হবে...অকাল কুয়াশা হবে...রহস্যময় ছবি হবে চোখের সামনে...আপনার রাগ আর আমার নির্লিপ্তি হাত ধরে কুয়াশায় হারিয়ে যাবে, দেখুন...

—আপনি কি করে বুঝলেন বৃষ্টি আসবে??

—এত তাপ, এত গরমের পরেই মাটি ভিজিয়ে সে আসে, তাকে আসতে হয়...এত পিপাসা আমার আপনার সকলের সবার এত আকুলিবিকুলির পরেই তো বৃষ্টি আসে...তার দলবল নিয়ে...

তারপর, গাড়িবারান্দায়ে পৌঁছে ভ্রাম্যমান পথ ধরে, আমি আপনি নিজের নিজের অনুভূতি নিয়ে, বাড়ি বসে টেলিফোনে প্রেম করবো...উপুড় হয়ে থাকা অন্ধকার ঘরের কোণে বসে...॥

যতটা শিকারী, শিকার ততটাই

শুভ আঢ্য

বরং সেই অঞ্চলবাসী কিছুটা বিকৃতমুখ এখন

তুমি জানো, তাই উঠোন পার করে দেখলে দেওয়াল
ভয়ডর ছেড়ে ভাবো বঁটির কথা
শানদার বঁটিই তোমার ক্লিভেজ

দিন নেই একটাও যখন তোমাকে ফাঁক করা হয়নি
হেঁসেল ছেড়ে ঘাম শুকানোর আগেই
অন্য স্যালাইভা মিটিয়েছে তেষ্টা তোমার
স্ত্রীরোগই একমাত্র বাঁচাতে পেরেছে তোমায়
তা'ও মোটে ক'টা দিন

তুমি আহত হলে দফারফা হয়েছে প্রিয় শিকারী
পাশে বসিয়েছে, স্বীকার করেছ শিকার তুমিই

জেতার ঘুঁটি এগিয়ে গেছে যখন, তুমি
তুমি কেবলই প্রিয়জনের শেষ পরিচ্ছেদ হয়ে থেকে গেছো

রোদ আর একটি শহরের কন্যা

রুমা ঢ্যাং

আমার এক শহর—
সে আজ বাণের জলে ভাসে।
নদীর অপর পাড়েতে—
রোদের কাছে ফুলেরা এসে হাট বসায়।

এক কোমর জলে ঢেকে দেয় সেই বাণের জমা জলে
শহরের পথ, বড় নির্জীব—
নিশ্চল শরীর থেকে ক্রমশ রক্তক্ষরণ!
প্লাবনজলের কন্যা গিয়ে রোদকে শুধায়—
'তুমি পারো না তোমার আলো দিয়ে শুষে নিতে সব জল!'
রোদের তখন প্লাবনকন্যা দেখার সাধ নেই আর!
যদি বা সে তাকায়ও বা... কিছুকাল পরে—
তবে তার শরীর থেকে লেলিহান শিখা পোড়াতে থাকে।
এদিকে পুড়তে পুড়তে মেয়ের শরীরে তখন থোকা থোকা ঘা,
আসলে শরীরের মেরুদণ্ডটাও পুড়ে গেছে!

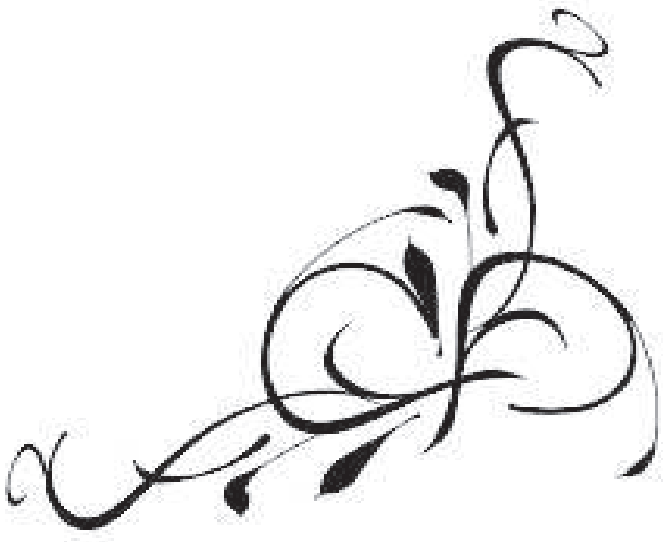

ইলুসন

চন্দন কিশোর

আমার হাতটা ধর। একফোঁটা জল গাল বেয়ে হাতের ওপর
পড়ে মিশে গেল। তুই আবার কেন এসেছিস? আমি
তোকে চাই। ফিরে যা। যাব না। ঠান্ডা জলের ওপর
গাছের ছায়া পড়েছে। ছোট্ট হাওয়ায় একটু নড়ে উঠলো।
দুটোই। প্রকৃতিও চায়। বাস্তব? একটা শুকনো পাতা
খসে পড়ল জলে। ঢেউয়ের তালে বয়ে গেল। আমি
একদিন এভাবেই মারা যাব। আমি বাঁচিয়ে রাখব
তোকে। পারবি না। তুইও জানিস। আর একটা ছোট
হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস মিশে গেল। দ্যাখ আমার
ওপরে তোকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! কি স্নিগ্ধ!
চোখ আবার জলে ভরে এল।
হাত পড়ল কাঁধে—কি হে শরীর খারাপ করল নাকি?
চোখেমুখে জল দাও অ্যান্ড স্টার্ট ওয়াকিং।
সকালের শান্ত হাওয়া রাতের গ্লানিতে
ধরিয়েছিল নেশা। বোধহয়।

কাব্যপ্রতিমার কস্তুরী ঘ্রাণে

সৌরিণ ভট্টাচার্য্য

কাব্যপ্রতিমার কস্তুরী ঘ্রাণে মগ্ন আমি,
এ হৃদয়কারার অন্তরে উথলিছে প্রাণ।
জেগে উঠেছে রোমাঞ্চ, ময়ূরপুচ্ছের রেশখানি
ধূলিধূসর সন্ধ্যায় কেবল এক মোহ আনে।
তন্দ্রাচ্ছন্ন অন্তিম প্রহর, শূন্য বিহ্বল বাতাস,
অগ্নিকোণে বিস্তীর্ণ রেখা আর দুটি পতত্রের প্রসার।
এ বনে প্রবেশ করলাম, মায়াবী ফুলের অনুরতি,
রেশমী আঁচলে বিন্যস্ত ফোটনের রেশ।
বেগনি আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কম্পনে,
নক্ষত্রবর্গের অবক্ষিপ্ত নিষ্প্রভ প্রতিভাসে
দিগ্-দিগন্তের গাঢ় নিবিড় তরুর ঘেরাটোপ।
প্রতিমা দিলেন দেখা, ক্রন্দনলালিত নিস্পৃহতা;
অগ্নিশাবকের চঞ্চু হতে ছিনিয়ে যায় তরল স্বর।
মিশে যায় আঁধার, লোহিতপারের বিস্তৃত বর্ণালীতে;
শিহরিত বাতাস, হয়ত তার সঙ্কেতে সন্ধ্যাস্বপ্ন;
রাত্রির ধ্বনি উঠলো বেজে, ভয়াল গর্জনে।
দারুচিনি-এলাচ-লবঙ্গের ঘ্রাণে অগ্রসর স্বদন্ত,
তারই পিছে এক মুগ্ধ পথিক ধাবমান, অবচেতনে।
প্রতিমার সৌন্দর্যে স্বদন্ত ও পথিক,
কণ্টকসংকুল পথে রক্তাক্ত পদ অগ্রাহ্য প্রায়;
অনুসৃত সেই নিবিড় বনমোহিনীর সন্ধানে।
হিমেল স্পর্শ ভেসে আসে, স্কন্ধে ও গ্রীবায়,
সর্পদংশনের ন্যায় তরল, সঞ্চিত প্রক্ষেপ—
আবিষ্ট মন ও দেহ, পরাবাস্তব শয্যালোকে।

পাগলের জন্য গোলাপ

মৃণ্ময় চক্রবর্তী

পাগলের হাতে গোলাপ দিলে
সে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দেবে,
আর তা দেখে সবাই হা হা করে উঠবে!
এটাই তো স্বাভাবিক,
তার আবেগ টাবেগের বালাই নেই.
সত্যি বলতে গোলাপ তো একটি
হৃদয়হীন হাসি ছাড়া আর কিছু নয়!
সবাই গোলাপের দিকে তাকায় আর ভাবে
গোলাপ তাকেই ভালোবাসছে!
নিজেরই অজান্তেই তারা
কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়।
কিন্তু পাগলের হাতে গোলাপ দিয়ে দেখুন
সে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দেবে।
পাগলের মত বুদ্ধিমান হতে শেখেনি অনেকেই,
ফলে তারা তার কাঁটা টের পায় না,
তারা তার মিথ্যে হাসি
পড়তে চায় একটা প্রগাঢ় কবিতার মতো!

শ্রাবণ

বিশ্বজিৎ শাসমল

কালো মেঘ জমে ধীরে ধীরে
আকাশকে ঘিরে
ভয়ানক রূপ নিয়ে তার,

নীল দেশ ঢাকে চাদরেতে
বাসা বেঁধে সাথে
আলোভাবে ছাইছে আঁধার,

শীতল বাতাস যায় উড়ে
চারিদিক জুড়ে
বয় সাথে ধূলাবালি ভার,

আড়ালেতে লুকিয়েছে রবি
অদৃশ্য ছবি
মেঘ আজি বাঁধে তার দ্বার,

গাছপালা একদিকে দোলে
উত্তুরে হেলে
বশ্যতা করছে স্বীকার,

শুকনো পাতার ঝড় ওঠে
এঁকে বেঁকে ছোটে
বাতাসেতে বিপুল সম্ভার,

বিদ্যুৎ আকাশেতে ডাকে
ধীর হতে বেগে
মেঘ ভেঙ্গে দেয় হুংকার,

অঝোর বর্ষা আসে নেমে
মৃত্তিকা প্রেমে
জলকণা আজ পত্রকার॥

অজাত

সায়ন্তনী নাগ

চোখের সামনে একটার পর একটা দরজা খুলে যাচ্ছে। যেন আমি উড়ে উড়ে প্রবেশ করছি ভেতরে। ঘরের মধ্যে ঘর। তার মধ্যে আরও একটা ঘর। তার মধ্যে আরো একটা। প্রত্যেকটা ঘরে অজস্র রঙিন রঙিন জিনিস। থরে থরে সাজানো। একই জিনিস, শুধু নানা রঙের। লাল, হলুদ, কমলা, সবুজ। যেন একটা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। কিম্বা একটা ফ্যাক্টরি। নানা রঙের চেয়ার, টেবিল, টুল...যেন অনেক মোল্ডেড ফার্নিচার পরস্পর রাখা। তাদের মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি। বা ভেসে চলেছি। কেউ একজন নিয়ে চলেছে আমায়। কোথায়? জানি না। কোথা থেকে এলাম? মন পড়ছে না। কি জানি একটা ঘটার কথা ছিল। সেটা কি ঘটল না? তবে কি আমি মরে গেছি? মরে গেলে তো যেখানে খুশি যেতে পারে আমার আত্মা। কিন্তু আমি তো তা পারছি না। এখানেও আমায় কেউ চালনা করছে একটা নির্ধারিত পথে। আমি আরো গাঢ়তর রঙের সাম্রাজ্যে তলিয়ে যাচ্ছি। মরে গেলে তো মস্তিষ্কও কাজ করে না। তাই কি আমি কিছু মনে করতে পারছি না? কিন্তু কিছু তো টের পাচ্ছি। এটা কি স্বর্গ? না নরক? অনেক গলার শব্দ, অনেক আওয়াজ মিলে মিশে একটা প্রতিধ্বনির মতো ঢেউ মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ছে। যেন আবহসঙ্গীত। এই যদি মৃত্যু হয় তাহলে মানুষ মরতে এত ভয় পায় কেন?

★ ★ ★

ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে দাঁত দিয়ে ক্রমাগত নখ কেটে চলেছে অর্ণব। ঠ্যাং নাচাচ্ছে। অহনা থাকলে হাঁটুতে একটা আলতো চাঁটি মেরে থামিয়ে দিত। অহনা নেই। ওটিতে কখন ঢুকিয়েছে। অথচ মিনিট পনেরোর বেশি লাগার কথা নয়। দেরি হচ্ছে কেন? জঘন্য একটা নার্সিং হোম। লাউঞ্জে একটা টিভি পর্যন্ত রাখতে পারেনি। একটা নাচ কিম্বা সিনেমা চললে তবু পেশেন্ট পার্টির মন একটু অন্যদিকে সরে। রিসেপশনিস্ট মানে একটা ষাট বছরের বুড়ি। রোগা, নুয়ে পড়া চেহারা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। সুন্দরী কোনো স্টাফও কি একটু জোগাড় করতে পারে না এরা? তাদের দিকে তাকালেও তো সময় কাটে। কতবার আর সিগারেট খাওয়ার ছুতোয় বেরিয়ে যাওয়া যায়! তায় আবার এখন বৃষ্টি নেমেছে। টেবিলে পড়ে থাকা কাগজগুলো দুদিনের বাসি। তাও পড়ে ফেলেছে অর্ণব। পাত্রী চাই। স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুনা। মনে হয় মোটা ধুমসি হবে। কাগজটা নামিয়ে রাখে ও। সবুজ পাড় শাড়ি পরা কালো মোটা আয়াগুলোকে দেখলে অশোকবনের চেড়ি মনে হচ্ছে। এমন করে অর্ণবের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে ওরা, যেন ও চিড়িয়াখানার কোনো অদ্ভুত জন্তু। আশ্চর্য, ওকে কি ওরা খুনী ভাবছে নাকি?

★ ★ ★

ওটিতে এপ্রনের পকেট থেকে তোয়ালে রুমাল বার করে অদৃশ্য ঘাম মোছেন ডক্টর চ্যাটার্জী। এসি তো পুরোদমেই চলছে। পালস রেট, হার্ট বিট... সব ঠিকঠাক। রক্তপাতও মোটামুটি কন্ট্রোলের মধ্যে। একটু আগেই

বার করে আনা হয়েছে অযাচিত প্রাণপিণ্ডটাকে। এখনও পর্মেশন হয়নি তেমন কিছু। পেশেন্টেরও কোনো সমস্যা ছিল না...প্রেশার, সুগার, থাইরয়েড সব নর্ম্যাল। নার্ভাসও মনে হয়নি। অ্যানাস্থেসিস্ট ডক্টর লাহিড়ী দিনে বিশটা লোককে ঘুম পাড়াচ্ছেন পাকা হাতে। তাঁরও কোনো ভুল হওয়ার কথা নয়। অথচ এখনো পেশেন্টের জ্ঞান ফিরছে না। ওটির নার্স মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে। ডক্টর চ্যাটার্জীকে কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিয়েছে। বোধহয় চোখে মুখে টেনশনটা পড়তে পারছে। এমন গোলযোগ তো আজ অবধি কোনোদিন হয়নি। কতবার তো নিপুণ হাতে মায়ের শরীর থেকে টেনে আলাদা করেছেন অনাকাঙ্ক্ষিত, অপরিণত শিশুভ্রূণ। পেশেন্ট এমন ফিট হয়ে গেছে বিকেলবেলাই, যেন ঘণ্টা কয়েক মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখে বা স্পা করিয়ে বাড়ি ফিরছে। কয়েকজনের অবশ্য কিছু আফটার এফেক্ট থাকে। মাথা ঘোরা, গা বমি। কতগুলো ন্যাকা ন্যাকা মেয়ে তো পুরো এলিয়েই থাকে, যেন লেবার পেন সহ্য করেছে। অথচ এ পেশেন্ট ছিল একদম অন্যরকম। সাতদিন আগে যখন চেম্বারে এসেছিল দুজনে, ডক্টর চ্যাটার্জীর বেশ ভালো লেগেছিল...বাহ, দিব্যি মানানসই কাপল। আজকাল তো কেউ শাঁখা সিঁদুর পরে না, ফলে ভেবেছিলেন, ওরা বোধহয় ফার্স্ট ইস্যু পেতে চলেছে। সে ভাবনাটা মুছে গেছিল কথাবার্তা শুরু হতেই। ওরা বিবাহিত দম্পতি নয়, একসঙ্গে থাকে বেশ কিছুদিন। তার মধ্যে ঘটে গেছে দুর্ঘটনা। এখন মুক্তি চায়। মুক্তি দেবার জন্য ডক্টর চ্যাটার্জী তো আছেনই। শুধু ডেলিভারি কেস করলে তো চলে না, সঙ্গে এ সবও সামলাতে হয়। কেরিয়ারের প্রথম দিকে খারাপ লাগত। এখন জলভাত। প্রায় রোজই দু-একটা থাকে। মাঝবয়সের আচমকা প্রেগন্যান্সি, সদ্য বিয়ে করেই মা হতে না চাওয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন পুরুষের অসহায় প্রেমিকা...কত শরীরই তো ঘাঁটা হয়ে গেল। তাদেরই একজন এই মেয়েটা। খুব কনফিডেন্টলি সাদা কাগজে লিখে দিয়েছিল, 'আই ওয়ান্ট টু টারমিনেট দ্য প্রেগন্যান্সি।' ডক্টর চ্যাটার্জী শুরু করেছিলেন ব্লাড টেস্ট, ইউ এস জি, ওষুধপত্রের ফিরিস্তি। এই তো দশটার সময় অ্যাডমিশন নিয়ে ফোন করল, 'ম্যাডাম, আমি এসে গেছি!' জ্ঞান হারাবার আগেও একটু হেসেছিল। বুকের মধ্যেটা হঠাৎ ছ্যাঁত করে ওঠে ডক্টর চ্যাটার্জীর। একটু কি ম্লান ছিল হাসিটা? চোখের কোণদুটো কি একটু ভিজে ছিল? গ্লাভস খোলেন ডক্টর চ্যাটার্জী। অপেক্ষা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

★ ★ ★

মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে অর্ণবের। অহনাকে খালি পেটে থাকতে হবে বলে ও আজ চা-ই বানায়নি। ফুটপাথের ট্যালট্যালে চা খেতে অসহ্য লাগছে। ডক্টর চ্যাটার্জী একটু আগে গম্ভীর মুখে জানিয়েছেন এখনো জ্ঞান ফেরেনি। উনি অপেক্ষা করছেন। অর্ণবও। রাগে, দুশ্চিন্তায় মাথা দপদপ করছে। সব অহনার কারসাজি। এমনটি হবার কথাই নয়। প্রিকশন না নিয়ে কোনোদিন...! তাও ডেট স্কিপ করল অহনা। নিজেই কিট কিনে টেস্ট করল। অর্ণব তখনও সিওর ছিল, নেগেটিভ হবে। হল না। অর্ণব ভেবেছিল ওষুধ দিয়ে খালাস করে দেবে। ইউ এস জির রিপোর্ট বলল, অসম্ভব। গভীর ষড়যন্ত্র। সব যেন অর্ণবের বিরুদ্ধে যাবে বলেই ঘটেছে। তোর শরীর, তুই টের পাসনি কেন? বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ওষুধ খেয়ে নিলেই তো পারতিস! ডক্টর চ্যাটার্জীর কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয় অর্ণবই। নাহলে টালবাহানা করে আরো কটা দিন কাটিয়ে দিত। মুচকি হেসে বলেছিল, 'যদি রেখে দিই?' ঠোঁটে চার অক্ষর গালি এসে গেছিল অর্ণবের। ন্যাকা! বোঝে না যেন কিছু! সামনে প্রোমোশনের পরীক্ষা। পাশ করলেই ফিলাডেলফিয়ার প্রোজেক্ট! অহনার ফ্যাশন ডিজাইনিং কেরিয়ারও সবে স্টার্ট দিয়েছে! সবে তো মোটে

তিরিশ! জীবন এখন উপভোগ করবে তা না, কাঁথাকানি, ডায়াপার, দুধের বোতল, ভ্যাক্সিন চার্ট! জাস্ট ভাবা যায় না! তাছাড়া সই সাবুদ, সাত পাক—কিছুই হয়নি, হওয়ার তেমন চান্সও দেখছে না। বলা কি যায়, কখন কি ঘটে! বাচ্চা-টাচ্চার পিতৃপরিচয়...ও বাবা, সে অনেক কঠিন দায়িত্ব! অহনার প্রতি ভালোবাসায় কোনো খামতি আছে নাকি অর্ণবের? খামোখা এই বাঁশ ঘাড় পেতে নেওয়ার কোনো মানে আছে? এসবের কোনো উত্তর নেই অহনার। গতকাল রাতেও টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অহনা।

'কি দেখছ?'

'তোমায় কেমন আর্নল্ড সোয়ারজেনেগারের মতো দেখতে লাগছে!' মুচকি হেসে বলেছিল অহনা।

'মানে?'

'টার্মিনেটার!'

বোঝা উচিত ছিল। তখনই বোঝা উচিত ছিল। যদি জ্ঞান আর নাই ফিরে আসে? কি করবে অর্ণব? দুশ্চিন্তায় টিশার্ট ভিজে গেছে ওর। থানা পুলিশ? কোর্ট কাছারি? মান সম্মান সব ধুলোয় মুছে যাবে যে! ভিসা হবে না! চাকরিটাই যাবে শিওর! কাকে বলবে? কে দাঁড়াবে পাশে? যারা যারা জানে এই অ্যাফেয়ারের কথা? তারা সব সুখের পায়রা। বাড়ি এসে বোতল খুলে বসতে পারে। চান্স পেলে অহনার সাথে ফ্লার্ট করতে পারে। বিপদে? টিকি দেখা যাবে না। নার্সটা পর্দা ফাঁক করে ইশারা করতে আবার দৌড়ে যায় অর্ণব।

★ ★ ★

কেউ আমার আঙুলটা ধরে আছে। নরম ছোট্ট একটা মুঠোয়। আমি আর ও ভেসে চলেছি এই রঙিন মেঘের দেশে। ওর গায়ে সাদা রঙের পাতলা পোশাক। হাতে একটা লাঠির ডগায় তারা থাকলেই যেন হয়ে যেত দেবদূত। গালে টোল। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—নরম পশমের মতো ওর চোখ আলতো বোজা।

'মা!' ও ডেকে ওঠে আমায়।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তুমি আমার কাছে যাচ্ছো। আমার সাথে।'

'কোথায়?'

'যেখান থেকে আমি এসেছিলাম। তুমিই তো আমায় ডেকে এনেছিলে। আমি একটা সাদা ফুলের পাপড়ির মধ্যে গুটিশুটি ঘুমোচ্ছিলাম। তুমি বললে, আমার কাছে আয়! অমনি চলে এলাম।'

'তাহলে রইলি না কেন?'

'তুমিই যে আর চাইলে না আমায়! একটা সাগরের জলে মৎস্যকন্যার মতো ভেসেছিলাম আমি। তুমি উপড়ে আনলে। আর দম বন্ধ হয়ে এল। কি বিষ চারপাশে! কি স্বার্থপর সুবিধাবাদী আত্মকেন্দ্রিক এই শ্বাসবায়ু! থাকতে পারলাম না। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি ফুলের পাপড়ির দেশে।'

'আর আমি?'

'তুমি এই একটা মাস আমায় ঘিরে রেখেছিলে তোমার শরীরের ওম দিয়ে। ভালোবাসা দিয়ে। আমি জানি, নিরুপায় না হলে আর কিছুদিন পরেই তুমি আমায় দিতে তোমার সবকিছুর ভাগ! দিতে খাবার, রক্ত, অস্থি, মজ্জা। আমি যে তোমায় বড্ড ভালোবেসে ফেলেছিলাম! তাই এবার ফেরার সময় তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

ওখানে আমার পাশের গোলাপি ফুলের পাপড়িতে তুমিও ঘুমিয়ে থাকবে। যতদিন না আর কেউ তোমায় ডেকে নেয় মর্যাদায়। ডেকে নেয় সততায়।'

'কিন্তু সোনা, আমি যদি চলে যাই, কে তোকে আবার আনবে? এবার তো তোকে উপড়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছি আগাছার মতো! একবার না একবার তো পারবো তোকে জল দিয়ে, সার দিয়ে, মাটি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে! এবার না হয় এখনো তোর মেরুদণ্ড হয়নি, শুধু হৃদ্ঘাতটুকুই এসেছে ধুকপুক ধুকপুক, যা শুনেছে কেবল আলট্রা সোনোগ্রাফির মেশিন! আমাকে যে প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকায় ওই স্পন্দন শুনে যেতে হবে। নাহলে কি করে আরেকবার তোকে ডেকে নেবার সাহস জমাবো বুকে? কি করে বড় করব আমার আকাঙ্ক্ষার মতো, প্রতিবাদের মতো, স্বপ্নের মতো?'

'তবে আমি একাই যাই?'

'যা সোনা! কিন্তু আবার আসবি তো?'

'আসবো মা। তুমি মনে প্রাণে চাইলেই আসব। হয়তো আমি নয়, অন্য কেউ। আমরা তো বড্ড নরম, বড্ড ছোট। ভুলেই যাব আমাদের উপড়িয়ে ফেলেছিলে! ভুলে যাব একদিন আমি ছিলাম অনাকাঙ্ক্ষিত। ডাকলেই চলে আসব ভালোবাসার কাঙাল, ভালোবাসার ভিখারি! তোমার ঠোঁটের চুমুর লোভে, বুকের দুধের লোভে, গায়ের গন্ধের লোভে আসব একদিন। হয়তো সেদিন আমার মেরুদণ্ড থাকবে, হাতের মুঠোও হবে শক্ত। এত সহজ হবে না উচ্ছেদ, উৎখাত। তখন গর্ভের আঁধার নয়, মুক্তির আলোয় তোমাকেই আমি আশ্রয় দিতে পারব!'

'আসিস সোনা। আমি দিন গুণব। ভুলিস না আমায়।'

★ ★ ★

স্বস্তির শ্বাস ফেলে অর্ণবের দিকে ফেরেন ডক্টর চ্যাটার্জী। 'নিন, আপনার পেশেন্টের জ্ঞান এসে গেছে।'

সে

বিশ্বনাথ ব্যানার্জী

শেষ রাতের ক্লান্ত শহর। রাতজাগা কিছু পাখি ছাড়া সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। অথবা প্রস্তুতি নিচ্ছে একটা নতুন দিন—একটা নতুন যুদ্ধের। ফুটপাতের কুকুরগুলো বোধহয় এবার ঘুমিয়ে পড়বে।

নিয়নের বাতিগুলোর ক্লান্তিহীন চোখ একইভাবে জ্বলছে নিবছে।

এমন সময় সে এসে দাঁড়ালো বাড়িটার সামনে। আশ্চর্য! এত লঘু তার চলা—বাতাসের মতো—কুকুরগুলো টের পেল না তার উপস্থিতি। তারা একটুও আওয়াজ করে উঠলো না। বুঝতেই পারল না তাদের রাজ্যে হানাদারের উপস্থিতি।

নিয়নের আলো পিছলে পড়েছে তার রেশমি স্রোতের মতো অবিন্যস্ত চুলের উপর দিয়ে। আধো আলো অন্ধকারে তার মুখ যেন রহস্যময়ী স্ফিংক্স। তার সবুজ দুটি চোখে কোনো রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় ইংগিত।

বিষণ্ণ এক নারী—যে নারী বিষণ্ণ হলে পুরুষের রক্তকণিকা চঞ্চল হয়ে ওঠে—যে নারীর সৌন্দর্য পুরুষকে উন্মাদ করে—সেই নারীর বিষণ্ণতা দেখার জন্যে কেউ পথে জেগে নেই।

সবার মতো সেও এসেছিল একদিন এই মহানগরের বুকে—যে মহানগর সবাইকে কাছে টেনে নেয়। সেদিন অন্তত সে তাই জানত। শুনেছিল অনেকের মুখে—এই মহানগর হীরের সমঝদার—প্রতিভা থাকলে কারুকে এই শহর ফেরায় না। সে জানতো সে অভিনয়টা ভালোই করে—অভিনয়ের মধ্যে প্রাণ ঢেলে দেয়। ছোটবেলা থেকে সবাই বলত। আসল নকল অভিনয়ের সময় এক হয়ে যায়।

অথবা তার জানা ভুল ছিল। মহানগর এর অন্য এক রূপ সে দেখেছে। এক পাপ-পঙ্কিল রূপ। আলোর নীচে অন্ধকার। ক্লেদাক্ত এক পঙ্কিল আবর্তে আবর্তিত হতে হতে আশাহীন, আশ্রয়হীন, কর্মহীন সেই নারীর জীবনে এলো এক সর্বনাশের রাত।

হঠাৎ বাড়ির দরজা দুটো হাট করে খুলে গেল। স্ট্রেচারটা বয়ে নিয়ে এলো দুজন ডোম।

'এ ভাইয়া, থোড়িসি বানাই দেনা', একজন বলল।

বলে পীচিক করে থুতু ফেলল।

নির্লিপ্ত ভঙ্গী। নিরাসক্ত স্বর। মৃত্যুর সাথেই তাদের ঘরবার।

মেয়েটা একটু ঝুঁকে পড়ল। কেমন দেখাচ্ছে নিজের মুখটা। কিন্তু তখন বড্ড ভিড় বাড়িটার সামনে। ভিড় ঠেলে এগোনো মুশকিল। তবু মেয়েটা চেষ্টা করতে লাগল।

আশ্চর্যের ব্যাপার—কারুর মুখে শোকের ছায়া-মাত্র নেই।

নামহীন গোত্রহীন যে মানুষ মারা যায়—যার মৃত্যুতে দুফোঁটা চোখের জল কেউ ফেলে না—তার জন্মে আনন্দ করার জন্যে ওপারের বাসিন্দার অভাব হয় না।

ক্ষিদে

অ্যাঞ্জেলিকা ভট্টাচার্য

৫ ফুট ৬ ইঞ্চির প্রণব রায় চৌধুরীর শীর্ণ দেহটা কিছুক্ষণ ছটফট করল, বুকটা বেশ কয়েকবার ওঠানামা করল তারপর স্থির হয়ে গেল। বাইরে তখন ঝড়ো হাওয়া আর মুষলধারে বৃষ্টি। থেকে থেকে বাজ পড়ার শব্দ। গত কয়েকদিন ধরেই এমন চলছে। খবরে বলেছে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ হয়েছে। আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় আকাশ পরিষ্কার হবে। এই আবহাওয়ায় রাতে পেচ্ছাপটা একটু বেশিবার করেন প্রণববাবু। একটু আগেই বেডপ্যানে কাজ সেরেছেন। ওটাই ফেলতে গেছিলেন ষাট বছরের সন্ধ্যাদেবী। এখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টিউবের আলোয় জুলু জুলু চোখে সাক্ষী রইলেন স্বামীর অন্তিম নিঃশ্বাসের। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর উচিৎ জোরে চিৎকার করে কাঁদা, হাত পা ছড়িয়ে বিলাপ করা। সেই শুনেই আশে পাশের লোক দৌড়ে আসে। এ ক্ষেত্রেও সেটা হতে পারত। সন্ধ্যাদেবী এখুনি চিৎকার করলে উপর তলা থেকে ছেলে, বৌমা, নাতি সবাই ছুড়ে আসত। কিন্তু সন্ধ্যাদেবী মৃত মানুষটার মাথায় দুবার হাত বুলিয়ে ফ্যানটা জোরে করে সামনের চেয়ার টেনে একটু বসলেন। অন্য সময় হলে এখুনি গোঁগোঁ করত মানুষটা। বেঁকে যাওয়া মুখে আপ্রাণ কিছু বলার চেষ্টা। প্রথম প্রথম বোঝা যেত না। কি চাইছে। কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছর একটা জড় বস্তুরও অনুভবগুলো ধরা যায়। যেমন উত্তরের বন্ধ জানালাটা মাঝে মাঝে হাওয়ার দাপটে কেঁপে উঠছে। যেন বলছে অনেক কাল আমায় বন্ধ করে রেখেছ। অনেক বছর ওটা খোলা হয় না। ওটা খুললেই দেখা যায় একটা পচা ডোবা। গরম কালে একটা নিচু মাঠ হয়ে যায়। শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণে বাড়ির পাশের সেই ডোবাটা এখন পুকুর হয়ে গেছে। জানলাটা খুলতেই মুখে বৃষ্টির ছাট এসে পড়ল। বহুকাল বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি। সেখান থেকে ক্রমাগত ব্যাঙের তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে। সন্ধ্যাদেবীর মনে হল তার স্বামীর জন্য বুঝি ব্যাঙগুলো বিলাপ করছে। কিন্তু সন্ধ্যাদেবীর চোখে জল নেই। একটা নিশ্চিন্ত, শান্তি বিরাজ করে বেড়াচ্ছে মনে। তিনি কি পাষাণ হয়ে গেছেন? আসলে দীর্ঘ কুড়ি বছরের একটা লড়াই আজ থামল। যুদ্ধে জয়লাভ হল না পরাজয়, এটাই তিনি বুঝতে পারছেন না। দীর্ঘ কুড়ি বছর মানুষটা বিছানায় শয্যাশায়ী। আজকের দিনটা যদি কুড়ি বছর আগে আসত তাহলে তিনি সারা পাড়া জানিয়ে চিৎকার করে কাঁদতেন। সবাইকে জানাতেন তিনি কি হারালেন। সঙ্গে অনেক কিছু পেতেন সরকারি চাকরি, বকেয়া পাওনা গণ্ডা। কিন্তু মানুষটা কুড়ি বছর একভাবে পড়ে রইল। নিজের সর্ব শক্তি দিয়ে স্বামীর সেবা করেছেন। গু-মুত পরিষ্কার করেছেন। স্বামীর সেরিব্রাল স্ট্রোকের পর শুধু একটা জীবন বদলে যায়নি। সাথে আরও দুটো জীবন বদলে গেছে। প্রণববাবুর শরীরের বাঁদিকে কোনো সাড় ছিল না। মুখটাও বেঁকে গেছিল তাই ঠিক করে কথা বলতে পারত না মানুষটা। সমানে মুখ দিয়ে লালা পড়ত। অনেক কথা বলতে চাইতেন কিন্তু অর্ধেক কথা বোঝা যেত না। যখন স্ট্রোকটা হল তখন সন্ধ্যাদেবীর স্বামী প্রণববাবুর আরও দশ বছর চাকরী বাকি। সেদিন অফিস থেকে ফোন এসেছিল—প্রণববাবু অফিসের সিঁড়িতে পড়ে গেছেন। হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ধ্যাদেবী ছুটে গেছিলেন। তখনও ঠিক বিপদের আঁচ করতে পারেননি। পনেরোদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানির পর ডাক্তার জানালেন—প্যারালাইসিস হয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। তখন সন্ধ্যাদেবী ঠাকুরের কাছে স্বামীর মৃত্যু প্রার্থনা করেছিলেন। এই প্রার্থনাটা আজ কুড়ি বছর ধরে ভগবানের সামনে করে এসেছেন। কোন স্ত্রী কি করে? অসুস্থতার কারণে প্রণববাবুকে স্বেচ্ছা অবসর নিতে হল। অফিস থেকে এককালীন কিছু টাকা পাওয়া গেল। তার বেশিটাই চিকিৎসায় বেরিয়েগেল। একমাত্র ছেলে

তখন উচ্চমাধ্যমিক দেবে। একটা আস্ত পাহাড় যেন সন্ধ্যাদেবীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হল। তবু মাথার উপর শ্বশুরের ভিটেটা ছিল। নইলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন হাওয়ায় ভাসছে। দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটার দিকে চোখ আটকে গেল সন্ধ্যাদেবীর—বছর চল্লিশের একটা বউ শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। বউটার উন্নত বক্ষ থেকে আঁচলটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বক্ষসন্ধিতে আটকে আছে জমাট আকাঙ্ক্ষা নাকি যৌনতা। সমাজ যাকে বলবে নিষিদ্ধ চিত্র। সন্ধ্যাদেবীরও গায়ের আঁচলটাও খসে পড়েছে। কোনোদিনই ব্লাউস পরে ঘুমোতে পারেন না। জোরাল টিউবের আলোয় আজ নিজের ঝুলন্ত স্তন দুটো দেখে নিজেকে কেমন ঘেন্না করছিল। গলার হারগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আয়নায় দেখা বউটার শরীরের সাথে মিলছে না নিজের শরীরটা। অযত্নের শরীরে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য ভাঁজ। বক্ষসন্ধিতে দেখা যাচ্ছে কালো নোংরার প্রলেপ। এই বক্ষসন্ধি দেখতে কত লোক উঁকি দিয়েছে এক সময়ে। দীর্ঘদিন শরীরে সাবান, সুগন্ধি ব্যবহার করা হয়নি। বউমা নাক সিটকে বলেছে—মা আপনার গায়ে এমন বিশ্রী গন্ধ কেন? সন্ধ্যাদেবী উত্তর খুঁজেছেন। হাত পা দুটো হাজার বার ধোয়ার ফলে হাজা হয়ে গেছে। রাতে চুলকানি বাড়ে। কত নারকেল তেল, সর্ষের তেল ঘষেছেন কিছুই হয়নি। স্বামীর বমি পায়খানা ঘাটতে ঘাটতে শরীর ছাপিয়ে গন্ধটা যেন পাকস্থলিতে ঢুকে পড়েছে। কতদিন খেতে পারেননি, ঘুমতে পারেননি। শুধু গন্ধ। স্বামীর কোনো অযত্ন হয়নি। নইলে এতদিনে শরীরটা পোকায় কেটে নরকের দুয়ারে পাঠিয়ে দিত। নিজের মনেই হাসলেন সময়টা কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটা কেমন নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে এখনো। সন্ধ্যাদেবী হিংস্র চোখে বললেন তুই হাসছিস কেন? বউটা খুব অবাক হয়ে বলল—তোর শরীরটা দেখে হাসি পাচ্ছে। এক কালে এই গতরের অহঙ্কারে সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিলি তাই না? সত্যি তো কম প্রলোভন আসেনি তো! পাড়ার রথিনদা, মুদি দোকানের নিমাই মণ্ডল সবাই সুযোগ নিতে চেয়েছে। সন্ধ্যাদেবী ফুঁসে উঠলেন এই শরীরে অধিকার শুধু মাত্র আমার স্বামীর। আয়নার বউটা অট্টহাস্য করে উঠল। সীতা হবার সাধ জেগেছিল বুঝি তোর মনে? কিন্তু সীতাকে যে মন্দিরেই ভালো মানায়। সীতা কি পেল বলত জীবনে? নিজের সতিত্ব প্রমাণ করতে অগ্নিপরীক্ষা! নিজের অপমান গিলে খাওয়া, সীতাও পারেনি সমাজের সাথে, তাইতো ধরণীর কোলে ফিরে গেল। সন্ধ্যাদেবী এলিয়ে পড়েছেন—অগ্নিপরীক্ষা সে তো সব মেয়েকেই দিতে হয় শুধু আগুনটা দেখা যায় না। আয়নার বউটা এখনও উত্তরের আশায় তাকিয়ে আছে। —কি হল কি ভাবছিস? সন্ধ্যাদেবী বিবর্ণ মুখে বললেন, যখন ওর সেরিব্রাল স্ট্রোকটা হল তখন শুধু ঘর আর হসপিটাল করেছি। ছেলের উচ্চমাধ্যমিক চলছে। মানুষটা যখন ঘরে ফিরল তখন একটা জড় পদার্থ। সবাই বলল আমার সিঁদুরের জোরে ফিরল। কিন্তু বিশ্বাস কর সারাদিন ধরে যখন মানুষটার সেবা করতে করতে ক্লান্ত, রাতের বেলায় মনে হত বালিশ চাপা দিয়ে খুন করি। রোজ স্নান করান খাওয়ান, শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে সামনের চেয়ারটাতে বসান। ডাক্তার বলত মুভমেন্ট করাবেন নইলে বেডসৌর হয়ে যাবে। পেন্সনের কটা টাকা ওষুধ কিনতে কিনতেই শেষ। তবু ভাগ্যিস সেলাই মেশিনটা ছিল। শাড়ির পিকো ফলস লাগিয়ে কটা টাকা পেতাম। ছেলেটা কলেজে পড়তে পড়তে একটা বেসরকারি চাকরি যোগাড় করে নিল। পড়াটা শেষ করল না। ছেলে কখন জোয়ান হয়ে গেল, প্রেম করল কিছুই টের পেলাম না। একদিন দেখলাম ঘরে বউ নিয়ে এসে বলল—মা আমরা কালীঘাটে বিয়ে করে নিয়েছি। নাতিও হয়ে গেল। সব যেন ঘোড়ার লাগাম লাগিয়ে ছুটে চলল। আমি শুধু বুঝলাম না কখন দিন হল, কখন রাত হল। জীবন কেটে গেল। আয়নাতে বউটার খুব আরাম করে বসে পড়ল মাটিতে। কিন্তু কি নির্লজ্জ বুকের আঁচল এখনও টেনে নেয়নি। উদলা স্তনবৃন্তগুলো এখনও জেগে আছে। যেন বাসনা এখনও মেটেনি। সন্ধ্যাদেবী মুখ ঢাকলেন। বউটার খিল খিল হাসি বৃষ্টির সাথে মিশে যাচ্ছে।—সেদিন

লজ্জা করেনি? যেদিন জানলাটা খোলা রেখেই পাশের মেস বাড়ির ছেলেটার মাথা খাচ্ছিলি? সন্ধ্যাদেবীর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে—আমি কি রক্ত-মাংসের মানুষ নই? আমার ইচ্ছেগুলো খুন করতে পারিনি সেদিন। ছেলে সেদিন কলেজ থেকে ফিরতে বেশ দেরি করেছিল। গা ধুয়ে তুলসি তলায় প্রদীপ দেব। দেখলাম পুবের জানলাটা খোলা। পাশের মেসবাড়ির একটা ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা আমার থেকে অনেক ছোট। কিন্তু লোভ হল। আমি দেখালাম আমার ঐশ্বর্য। ছেলেটা হাতের ইশারায় আসতে বলল। আমি স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলাম। বউটা খুব উৎসাহিত হয়ে বলল—তারপর?—তারপর আমি ভয়ে জানলাটা বন্ধ করেদিলাম। আর নিজের লোভটাকে খুন করলে? লোভকে কি তুই সরিয়ে রাখতে পেরেছিস? সন্ধ্যাদেবী ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছেন তাহলে কি মেয়েটা সব জেনে ফেলেছে? সেদিন কি ঘটেছিল? স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন—হ্যাঁ, আমি পেরেছি। বউটা খুব হাসছে। তবে সেদিন তুই যেটা করেছিলি ঠিকই করেছিলি। শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে বউটা উন্নত স্তনের বোঁটাটা দেখিয়ে বলল ইস সেদিন কি কামড়টাই না দিয়েছিল ছেলেটা তাই না? বলে আড় চোখে সন্ধ্যাদেবীর দিকে তাকালেন। সন্ধ্যাদেবীর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি শুনতে পাচ্ছে ঘরের দেওয়ালগুলো। সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি, ছেলে গেছে অন্য শহরে চাকরীর পরীক্ষা দিতে। স্বামী সেবায় ক্লান্ত হয়ে বসেছিলাম দরজায় হেলান দিয়ে। পাশের মেসের ছেলেগুলো একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে যে যার কাজে। ওদের মধ্যেই একটা ছেলে কাছে এসে বলে গেল—বউদি আমাদের এক বন্ধুর ভীষণ জ্বর। ওষুধ খেয়ে শুয়ে আছে, পারলে একবার মাঝে দেখে আসবেন।

বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশের একটা ছেলে বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। ওকে ডাকতেই খুব কষ্টের সাথে মুখ ফেরাল। সেদিনের ওই ছেলেটা! যাকে দেখে লোভ জেগে ছিল। ছেলেটার চোখ লাল। গায়ে হাত দিতেই মনে হল গা পুড়ে যাচ্ছে। ছেলেটা ইশারায় টেবিল-এ রাখা ওষুধগুলো দিতে বলল। নিজে এগিয়ে গেলেন মাথাটা উঠিয়ে ওষুধ খাওয়ালেন। ছেলেটা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। ক্রমশ দৃষ্টি নেমে যাচ্ছে ঠোঁট, গ্রীবা বক্ষ সন্ধি স্থলে। ছেলেটার লোমশ বুকের উত্তাপ মিশে যাচ্ছে বহুদিনের উপোষী ক্ষুধারত এক নারী শরীরের সাথে। শুষ্ক মরুভূমির মতো ঠোঁট খুঁজছে দুরন্ত ঝর্না। দুটো শরীর জিব দিয়ে চেটে নিচ্ছে নিজেদের লজ্জা, ঘৃণা। শরীর যে এতটা অবাধ্য হতে পারে, সেদিন জেনে ছিল সন্ধ্যাদেবী। সেদিন ক্ষিদে মিটেছিল সাথে আরও ক্ষিদে বেড়ে গেছিল। শরীর লাগামহীন হতে চাইছিল। মন তার ইন্ধন যোগাচ্ছিল। কিন্তু খেলাটা সেদিনই শেষ করে এসেছিলেন সন্ধ্যাদেবী। আর কোনোদিনও ওমুখো হননি। ছেলেটার নাম জানা হয়নি। কয়েকদিন ছেলেটা ঘুরে ছিল, হয়তো কিছু বলার ছিল। কিন্তু সন্ধ্যাদেবীর মনে কি যেন একটা ভয় কাজ করছিল। যদি ছেলেটা কোনোরকম বিপদে ফেলতে চায়? পাড়াতে জানিয়ে দেয়। না ছেলেটা কদিন পর কোথাও চলে গেছিল। আর দেখা হয়নি। নিজের মধ্যে যে মহা ক্ষিদে জেগে উঠেছিল তাকে খুন করেছেন সন্ধ্যাদেবী। জড় পদার্থ স্বামী কি বিশ্বাস করেছে কোনোদিন শরীরের সব তাপ স্বামীর গু-মুতে বিসর্জন দিয়েছেন। সময়ে সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করেছে। শুধু গায়ের জোরটা দেখাতে পারেনি। আয়নার বউটা হেসে লুটিয়ে পড়েছে—কি এতো ভাবছিস? তোর সারা গায়ে একটু ডেটল ঢেলে দে। ক্ষিদেতেও কিছুটা ডেটল ঢেলে দিস। শুদ্ধ হবে। বাইরে কাক ডাকছে। এখুনি ঘুমন্ত রাস্তাগুলো জেগে উঠবে। বাড়িতে মানুষের ভিড় শুরু হবে। কিন্তু তার আগে এক দাবানল জেগে উঠেছে যেন পেটে। এতো ক্ষিদে যেন কোনোদিন পায়নি আগে। জল দিয়ে বিস্কুট গিলছেন গোগ্রাসে। তখনই দরজায় টোকা পড়ছে। কিন্তু ক্ষিদে যে কিছুতেই মিটছে না।

যাত্রা কথা

হরেন্দ্রকুমার ঘোষ

জ্যেষ্ঠ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও এইবারের ট্রেনযাত্রায় আমার আসনটি উপরে নির্ধারিত হইলো। উপরে চড়িবার ধকলটি অতএব সহ্য করিতে হইবে। কি আর করা যাইবে! অবশ্য বারংবার টয়লেটে থুরি টয়লেট নহে ওয়াশরুমে (অধুনা টয়লেট শব্দটির ব্যবহার শালীন সমাজে অচল) যাইতে না হইলে উপরের আসনটিও কিছু মন্দ নহে। বেশ নিরিবিলিতে যাত্রা করা যায় আবার নীচের আসনের যাত্রীদিগের রগড়গুলিও ভালই উপভোগ করা যায়। যাহা হউক, ট্রেনে আরোহণ করিবার পর দেখিলাম পূর্ব হইতে অধিকৃত নীচের আসনের একটিতে একজন মহিলা অপরটিতে একজন পুরুষ পরিপাটি শয্যা রচনা করিয়া শায়িত তবে নিদ্রিত নহে। পুরুষ ব্যক্তিটির বয়স অনধিক ষাট এবং মহিলাটির বয়স অনধিক ত্রিশ বলিয়া ধারণ হয়। উভয়েই সুশ্রী ও সুবেশ। অনুমান হয় উহারা পিতাপুত্রী। উহারা যেহেতু ট্রেনের উৎসে আরোহণ করিয়াছে অতএব এইটুকু মৌরসীপাট্টা উহারা প্রোথিত করিতেই পারে। উভয়ে গ্যাজেট লইয়া ব্যস্ত। পুরুষ ব্যক্তির হস্তে একটি আইপ্যাড এবং মহিলার হস্তে একটি স্মার্ট ফোন। অতএব উভয়ে আমার প্রতি নিস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিল মাত্র। আলাপ পরিচয়ের সূত্রপাত হইল না। সময় যেহেতু প্রভাত কাল সেই হেতু ইচ্ছা ছিল কিঞ্চিৎ সময় নীচে বসিয়া অতিবাহিত করিব এবং সহযাত্রীদিগের সহিত বাক্যালাপের মাধ্যমে সখ্যতা স্থাপন করিব কিন্তু উহাদের ভাবগতিক দেখিয়া ইচ্ছাটি সংবরণ করিতে হইল। কৃপা প্রার্থীর ন্যায় পদপ্রান্তে বসিবার ইচ্ছা হয় না। প্রথম দর্শন অতএব সহযাত্রীদের সম্বন্ধে মনে বিশেষ দাগ কাটিল না। অবশ্য প্রথম দর্শনে কারওর প্রতি কোন ধারনা গড়িয়া লওয়া উচিত নহে কারণ প্রায়শই তাহা ভুল প্রমাণিত হয়। দীর্ঘ সময়ের যাত্রাপথে, ক্রমশঃ শীতলতা হ্রাস পাইবে। উপরে আর একজন যাত্রী সমন্ধে কিছু বলিবার নাই, তিনি নিদ্রিত। তাহাকে দক্ষিণ ভারতীয় বলিয়াই প্রতীত হইল। আমিও অগত্যা আয়াসসাধ্য কাজটি করিলাম অর্থাৎ উপরে চড়িয়া স্থিত হইলাম।

দুরপাল্লার ট্রেন যাত্রা সততই আমার পছন্দ। পাঁচজন নতুন মানুষের সহিত আলাপ পরিচয়ের সূত্রে মানব মনের কত অজানা দিক উন্মোচিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের ভিতর আরও একটি মানুষ থাকে, পূর্ব পরিচয়ের জড়তা থাকে না বলিয়া কথাবার্তায় ভেতরের মানুষটি ক্রমে বাহির হইয়া আসে, একটি আখ্যানের উন্মেষ দেখা দেয়। এইবারে এই দুইদিন দুইরাত্রিরও বেশি সময়ের যাত্রাকালে নীচের দুই অসম বয়সী যাত্রীর কথাবার্তা বাদবিসংবাদ সকলি উহাদের জবানিতে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই স্থলে উহাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকৃত নাম যাহাই হউক আমি উহাদের নতুন নামকরণ করিলাম। মেয়েটিকে দেখিয়া বুদ্ধিদীপ্ত বলিয়া মনে হয় কিন্তু সে কিঞ্চিৎ স্থুল এবং আদুরেপনা যুক্ত। তাই তাহার নাম রাখিলাম 'বাবলি'। আর পুরুষ ব্যক্তিটি পোশাকের পারিপাট্যে চেহারার সতেজতায় একটা যুবাভাব ধরিয়া রাখিয়াছেন। অতএব ওনার নাম দিলাম 'নবকান্ত'।

কিছু সময় অতিবাহিত হইবার পর,—"দাদা শুনছেন? আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, একটু দেখবেন প্লীজ।" বাবলি নবকান্তের উদ্দেশ্যে এই কথা বলিল কিন্তু নবকান্ত বিশেষ কর্ণপাত করিল না। বাবলির তাড়া ছিল সে বাহিরে চলিয়া গেল। অল্পকাল বাদে বাবলি ফিরিয়া আসিয়া নবকান্তের উপর চড়াও হইল, "আপনি কেমন মানুষ! একটুও সৌজন্য বোধ নাই! একটা কথা বললাম গ্রাহ্যই করলেন না!

"কথা একটা বললে বটে কিন্তু কথার মতন কথা বলছ না, তাই গ্রাহ্য করিনি"—নবকান্তের উত্তর।

"কী এমন খারাপ কথা বললাম যে আপনার গায়ে (ছেঁকা) লাগলো? একসঙ্গে জার্নি করলে লোকে এরকম কথাতো বলেই থাকে।"

"খারাপটা কথায় নয়, খারাপটা সম্বোধনে। কোন সুবাদে তুমি আমাকে 'দাদা' বললে? অল্পবয়সীদের কাছ থেকে দাদা সম্বোধন বয়স্ক লোকের কাছে একটা ফাজিল সম্বোধনের মতন লাগে।"

"আপনারাতো সুবিধা মতন বুড়ো, জোয়ান হন। ফুলশ্লীভ টি শার্ট, ট্র্যাক প্যান্ট এইগুলো আপনার ধড়াচূড়া। এসব তো ইয়াংদের পোশাক। তাই পোশাকের রকম দেখে আঙ্কল না বলে দাদা বললাম।"

"তোমার মতে লুঙ্গি আর হাফশ্লীভ পাঞ্জাবি আমার পোশাক হওয়া উচিত ছিল, তাইতো? তাহলেই তুমি কাকু জেঠু কিছু একটা বলতে পারতে?"

"আমি সেরকম কিছুই ভাবিনি বরং আমি মনে করি, মানুষের বুড়ো হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু বুড়োটে হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। আপনার পোশাক আশাক, স্মার্টফোন আর ট্যাবলেটের ব্যবহার দেখে আমার ভাল লেগেছে যে আপনি বুড়োটে হয়ে যাননি। সেজন্যই হয়তো দাদা বলে ডেকেছি। যা হোক আমি ঘাট মানছি, আপনার সঙ্গে আর কথা বলছি না।"

উহাদের রাগবিরাগের কথা শুনিতে শুনিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা দ্বিপ্রহর নাগাদ তন্দ্রা টুটিল। দেখিলাম বাবলি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শায়িত এবং নবকান্ত কিঞ্চিৎ তৎপর। সে বাবলির উদ্দেশ্যে বলিল, "ওহে মেয়ে, দুপুর যে গড়িয়ে গেল এবারে একটু উঠে বস, দুটো কথা বলি।"

বাবলি উঠিয়া বসিল এবং খানিকটা রাগিত ভাবে কিংবা অভিমান ভরে বলিল, "আমি তো বলেছি আমি আর কথা বলছি না তবে কেন ডাকাডাকি করছেন?"

"আহা, কথা না হয় নাই বললে কিন্তু কথা শুনবেনা তাতো বলনি। কথার মতন আর কিছু কি আছে? কথাতেই যুদ্ধ কথাতেই সন্ধি, কথাতেই রাগ কথাতেই ভাব, কথাতেই মান কথাতেই মান ভঞ্জন।"

"হুঁ, বুঝেছি কথার অনেক শক্তি। এখন কি বলবেন বলুন।"

"বলছি কী, দুপুরের খাবারের অর্ডার তো দিলেনা তবে এবেলাটা কি হরিমটর চালানোর ইচ্ছে?"

"যেসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, যাহোক কিছু একটা হবে। আপনি আপনারটা নিয়ে ভাবুন।"

"সেকথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে—কন্যা সমা এক-সহ যাত্রী যদি না খেয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে পিতৃসম এক ব্যক্তি কেমন করে খায়।"

"আমি না হয়ে অন্য কেউ হ'লে আপনি এমন করে খাওয়া নিয়ে আন্তরিক হ'তেন কি?"

"না, তা হতামনা। তবে কিনা স্নেহ সর্বদা নিম্নগামী। তোমার মতন একজন কারেজিয়াস মেয়ের প্রতি স্নেহের উদ্রেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। স্নেহের বশেই একটু আধটু খবর নিচ্ছি আরকি।"

"কারেজিয়াসটা আবার কোথায় দেখলেন?"

"তোমার বয়সী মেয়েরা একা একা বড় একটা দূর পাল্লার ট্রেনজার্নি করে না। তুমি একাকী জার্নি করছ, কথাবার্তায় যথেষ্ট তেজি আছ। কারেজিয়াস তো তোমাকে বলতেই হয়।"

"একজন অজানা অচেনা মেয়ের প্রতি আপনার স্নেহের উদ্রেকই বা কেন হবে, কেনই বা তার খাওয়া না খাওয়া নিয়ে আপনি মনোযোগী হবেন?"

"বুঝতে পারছি তুমি এখনও খুব রেগে আছ। জান, কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে গেছেন যে রাগ হছে তরকারিতে লবনের মতন। পরিমাণ মত হলে বেশ উপাদেয় কিন্তু বেশি হলেই বিপত্তি। তাছাড়া কথায় আছে

একসঙ্গে দু'কদম চললেই নাকি দু'জন মানুষ পরস্পরের বন্ধু হয়ে যায়, আমরা প্রায় চারশো কিলোমিটার একসঙ্গে যাত্রা করে ফেলেছি আরও দু'হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ যাত্রা ক'রব। তাহলে আমরা তো এখন বন্ধুই, তাইনা?"

"আপনি কথার চাষ বেশ ভালই করেন, তার ফলনও বেশ ভাল। এখন বলুন আপনার ওই পরিমাণ মত লবণের খাবারটি কোথায়? সেটি কি প্যান্ট্রি কার থেকে আসবে?"

স্নেহের মুখে বাবলির রাগের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিয়া নবকান্ত ভারী আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "তা কেন! খাবার আমার সঙ্গেই আছে এবং যথেষ্টই আছে। আজ দু'জনেরই দু'বেলা হয়ে যাবে। তুমি না খেলে কাল অনেকটা ফেলে দিতে হ'ত। আর একটা কথা, তুমি অজানা লোকের কাছ থেকে খাবার খেতে ভয় পেও না। আমি নিজে খেয়ে তারপর তোমাকে খেতে বলবো, ঠিক আছে?"

এই কথার পর বাবলির চোখে সংশয়ের যে ভ্রুকুটি ছিল সেটি অন্তর্হিত হইল। ইতিমধ্যে আমাদের খাবারও আসিয়া গেল। আমরা অবতরণ করিলাম। উহারা ব্যস্ত হইয়া আমাদিগকে বসিবার জায়গা করিয়া দিল। এই পর্বে উহাদের সহিত কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ হইল। সকল কথাবার্তা ইংরাজিতে হইল। আমাদিগকে উহারা অবাঙালি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সে জন্যই হয়তো বা উহারা নিজেদের মধ্যে অধিক অকপটে কথা বলিতেছিল বা বলিবে। আমিও কোন গল্পের আভাসের আশায় ওৎ পাতিয়া আছি। যদি ভুল না দেখিয়া থাকি তাহা হইলে আহার করিবার সময় বাবলির দুই চোখের কোলে বাষ্প জমিতে দেখিলাম যেন। এটি ঘটিল তখনই যখন নবকান্ত পরম মমতায় বাবলির হাতে খাবারগুলি তুলিয়া দিতেছিল।

আহারের পর দিবা নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। চায়গরম শব্দে নিদ্রা টুটিল। লক্ষ্য করিলাম, বাবলি দুই কাপ চা খরিদ করিল এবং নিজের ঝোলা হইতে বিস্কুট ও অন্যান্য স্ন্যাকস্ বাহির করিয়া নবকান্তকে ডাকিল, "কাকু, ও কাকু বিকেল হয়ে গিয়েছে। চা নিয়েছি, উঠুন চা খাবেন।" নবকান্তও উঠিয়া বসিল, চায়ের আয়োজন দেখিয়া বলিল, "বাঃ বেশ চায়ের আসর বসিয়েছে তো!!" আমিও এক কাপ চা লইলাম এবং উহাদের কথোপকথন শুনিতে থাকিলাম। নবকান্ত বাবলির উদ্দেশ্যে কহিল, "এই ট্রেনটা যাচ্ছে বাঙ্গালোর পর্যন্ত, তুমি আসলে কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ? এবং একাকী কেন যাচ্ছ? এগুলো হচ্ছে বুড়ো মানুষ হিসেবে আমার কৌতূহল, উত্তর না দেবার মত কিছু নয়।" "প্রথমত, আমি যাচ্ছি চেন্নাই, দ্বিতীয়ত-যাচ্ছি চাকরিতে যোগ দিতে আর তৃতীয়ত, সঙ্গে নেবার মত তেমন কেউ ছিল না।"

"আমিও চেন্নাই পর্যন্ত যাব। যে কাজে এসেছি সে কাজ দু-একদিন বাদে করলেও কিছু এসে যায় না। তুমি চাইলে এই জনবহুল বিশাল শহরে স্বল্প সময়ের জন্য আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে পারি। বাবার বয়সী একজন লোক তোমার সঙ্গে থাকলে অফিস আদালতে তোমার হয়তো একটু স্বচ্ছন্দ লাগবে।"

"জানেন, এই ট্রেনটাকে আমাদের ওখানে 'মেডিক্যাল এক্সপ্রেস' নাম দিয়েছে। আমাদের ওদিক থেকে অসংখ্য মানুষ এই ট্রেনে করেই দক্ষিণ ভারতে আসে চিকিৎসা করাতে। আমি একটু শঙ্কিত ছিলাম যে, যদি আমার সহযাত্রী কোন রোগী হয় তাহলে কেমন করে ট্যাকল করবো। সাধারণ রোগীর পরিচর্যা কোন ব্যাপার নয় কিন্তু ব্যাথায় কাতর রোগীকে ট্যাকল করা বড্ড মুশকিল। যদিও এরকম ভাবাটা মানবিক নয়, মানুষের দিন সবসময় সমান যায় না। তবুও স্বার্থপর মন স্বাচ্ছন্দ খুঁজে বেড়ায়। ট্রেনে উঠে আপনাকে দেখে স্বস্তি পেয়েছিলাম। এখন দেখছি আপনি মানুষটা আমার ভাবনার চেয়েও বেশি স্বস্তিদায়ক। না কাকু, আপনাকে কষ্ট করে আর আমাকে সঙ্গ দিতে হবেনা। এই চাকরির সূত্রেই এই শহরে আমি একবার এসে গিয়েছি তাই কোন অসুবিধে হবে না।"

"আমার কৌতুহল আরও একটু বেড়ে গেল যে। তুমি আসলে কী চাকরি নিয়ে এখানে এসেছ?"

"আমি সিএসই পাশ করে করে এখন তামিলনাড়ু ক্যাডারের আইএএস অফিসার। যাব সচিবালয়ে, সেখানেই আমার পোস্টিং সংক্রান্ত কাগজপত্র পাব। হয়তো কোন জেলার কালেক্টর হিসেবে আমার পোস্টিং হতে পারে।"

বাবলির কথা শুনিয়া নবকান্ত কিয়ৎকাল নির্বাক এবং নির্নিমেষ হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "বাঃ এযে দারুণ খবর। তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল তুমি আর পাঁচজনের মতন সাধারণ নও তাই বলেছিলাম তুমি খুব কারেজিয়াস, স্পিরিটেড। এখন দেখছি তুমি যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্টও। সিএসই পাশ করাটা কোন সাধারণ ব্যাপার নয় যেখানে পাসের হার দশমিক ১ থেকে দশমিক ৩ মাত্র। এই পরীক্ষাটাই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হিসেবে গণ্য হয়। সেখানে আবার তুমি পেয়েছ গ্রুপ এ-র প্রথম ক্যাটেগরি আইএএস, যে কোন বাবা-মা তোমার মতন সন্তান পেয়ে গর্বিত হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, তুমি মেধাবী, যে কোন দিকেই তুমি বিকশিত হতে পারতে তবুও তুমি এরকম ঝুঁকিপূর্ণ ক্যারিয়ার কেন বেছে নিলে?"

"না কাকু, আমি ব্রিলিয়ান্ট ট্রিলিয়ান্ট কিছু নই। তিন বারের চেষ্টায় এই পরীক্ষায় পাশ করতে পেরেছি। এই ক্যারিয়ার কেন বেছে নিলাম তার কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। তবে দু-একটা কথা বলতে পারি। আমার বেড়ে উঠাটা খুব একটা মর্যাদা পূর্ণ ছিল না। নিজের বাবা মা থাকতেও যে ব্যক্তি অন্যের কাছে প্রতিপালিত হয় তার বেড়ে উঠা মর্যাদাপূর্ণ হতে পারে না। আপনার শুনতে খারাপ লাগবে তবুও বলি, পুরুষদের মেয়েদের প্রতি সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদ আমাকে খুব ব্যথিত করতো। প্রেম ভালবাসার মধ্যেও এই প্রভুত্বের চাপ দেখেছি। একটি ছেলেকে ভালবাসার স্বীকৃতি দিতেই শুরু হয়ে যায় প্রভুত্ববাদ। কথাবার্তায়, চলফেরায়, পোশাক-আশাক সব কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ। এই সবে খুব কষ্ট পেতাম, মনে হ'ত একটা মর্যাদা পূর্ণ অবস্থায় নিজেকে উন্নতি করতে পারলে হয়তো নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারব। এর থেকেই বোধহয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে আসার ইচ্ছে হয়ে থাকতে পারে।"

"কিন্তু মা, এই ক্ষেত্রেই কী তুমি স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে? এখানে যে অধিকাংশ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং সমাজবিরোধী মানুষেরা দুর্বল গণতন্ত্রের হাত ধরে ছলে বলে কৌশলে অধিকর্তা হয়ে বসে। এরাই হবে তোমার নিয়ন্ত্রক।"

"খুব খাঁটি কথা। প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তবুও অন্য যে কোন চাকরির তুলনায় এখান চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা বেশি গৌরবের হবে মনে হয়। জানিনা শেষপর্যন্ত পেরে উঠব কিনা।"

"এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে তুমি সত্যিই পারবে, অবশ্যই পারবে।"

পুনরায় বাবলির চোখের কোলে বাষ্প জমিতে দেখিলাম যেন। মেয়েটি দৃঢ়চেতা কিন্তু স্নেহ বুভুক্ষু সেই জন্যই বোধহয় এই বাষ্পরাজি। প্রাণীমাত্রই স্নেহের পরশ বুঝিতে পারে। উহাদের কথা শুনিতে এতটাই মগ্ন ছিলাম বুঝিতেই পারি নাই যে কখন রাত্রির আহারের সময় হইয়া গিয়াছে। সকলেই আহার সমাধা করিয়া শয়ন করিলাম।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করা আমার অভ্যাস, ট্রেনে ইহা আমার বিলাসিতা। এই সময় ট্রেনের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শীতল বায়ুর প্রলেপ লইতে লইতে চরাচরকে জাগিয়া উঠিতে দেখি। পূর্ব আকাশ ক্রমে রক্তিম হইয়া উঠে। শান্ত প্রকৃতি অপূর্ব শোভা বিস্তার করে। চলন্ত ট্রেন হইতে এই শোভা দেখিয়া মনে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি হয়। শয্যাত্যাগ করিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলাম নবকান্ত ও বাবলি তন্ময় হইয়া ব্রাহ্ম মুহূর্তের শোভা উপভোগ করিতেছে। হৃদয়বৃত্তির এক নিরুপম প্রকাশ। আমি নিঃশব্দে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অপর একটি দ্বারে স্থান লইলাম। ক্রমে বেলা বাড়িতে থাকিল, ট্রেনটিও জাগিয়া উঠিল। প্রক্ষালন ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া আমরা

তিনজনই নির্ধারিত স্থানে আসিয়া বসিলাম। এই পর্বেও কিঞ্চিৎ বার্তালাপ করিতে করিতে একত্রে প্রাতরাশ সমাধা করিলাম। দুই-চারিটি সৌজন্যমূলক কথা বলিয়া উপরে আসীন হইয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু মনোযোগের কেন্দ্র নিচেই রহিল।

বাবলিকে বলিতে শুনিলাম, "কাকু, গতকাল আমার সম্বন্ধে নানান কথা হ'ল কিন্তু আপনার কথা কিছুই হ'ল না। আপনি চেন্নাইতে কাজ নিয়ে এসেছেন নাকি বেড়াতে এসেছেন?" উত্তরে নবকান্ত বলিল, "হ্যাঁ কাজ একটা আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজই। কাজটা হচ্ছে এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করা। আসলে অজানা অচেনা রহস্যময় এক দেশে আমার যাবার কথা ঠিক হয়েছে কিন্তু দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। যে ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবো সে সম্ভাব্য দিনক্ষণের কথা বলবে। এ ব্যাপারে তার হাতযশ আছে। রহস্যময় দেশে যাবতো তাই যাবার আগে একটু গোছগাছ, একটু বিলিব্যবস্থা করতে হয়। সম্ভাব্য সময়টা জানা থাকলে সুবিধে হয়।"

"অত শক্ত কথা আমি বুঝিতে পারিনা। যার সঙ্গে দেখা করবেন সে কি ঐ দেশের এজেন্ট?"

"না ঠিক এজেন্ট নয় তবে ট্রাভেল গাইড বলতে পার। যাত্রাটা যাতে কষ্টদায়ক না হয় সেটা সে দেখবে। এটা কোন শক্ত কথা নয় আর বুঝেও তোমার কাজ নেই। তার চেয়ে বরং তোমার কথা বল। তুমি তো এখন তামিল ভাষা শিখে নিয়েছ, দু-একটা তামিল কথা শোনাবে?"

"ঠিক আছে শোনাব, যখন হকার আসবে তখন হকারের সঙ্গে কথা বলবো।"

"চাকরিতে যোগ দেবে কবে? প্রথমে উঠবে কোথায়?"

"লেখা রয়েছে তো ইমিডিয়েট যোগ দেবার কথা। উঠবো সরকারি গেস্ট হাউজে। চাইলে আপনিও আমার সঙ্গে থাকতে পারেন।"

"বেশ বলেছ মা, ট্রেনের পরিচয়ে একেবারে এতটা আপন করে নেওয়া! এত সরল হলে এই গুরুভার চাকরি তুমি কেমন করে সামলাবে? কিন্তু আমার হোটেল বুকিং রয়েছে, কোন অসুবিধে হবে না।"

সারাদিন ধরিয়া এইরূপ টুকিটাকি কথাবার্তা চলিল। মাঝে আহার এবং দিবানিদ্রাটিও মন্দ হইলনা। আজিকা দেখিলাম প্যান্ট্রিকার পরিবেশিত খাদ্যেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিল। ক্রমে সায়ংকাল সমাগত হইল। চা-পর্বে বাবলিকে বলিতে শুনিলাম, "কাকু, আজ রাতটা কাটলেই আমাদের জার্নি শেষ হবে। আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, আপন মনে হয়েছে। আমি চাই ভাল লাগাটা যেন বজায় থাকে কিন্তু আবার দেখা হবে কিনা জানিনা। অনেক কথা বলেছি, অনেক কথা বলিওনি। বলা কথার সবই ভাল নয়। খারাপটাকে মার্জনা করে দেবেন।"

"তোমার মুখ দেখলে মনে হয় তুমি একজন আদ্যন্ত ভাল মানুষ। খারাপ কথা তুমি বলতে পারনা, বলওনি। একটি খারাপ কথা বলার পর আমারও মনে হয় কেন এরকম করি! আজ আছি কাল হয়তো থাকব না। আজ যাদের দেখতে পাচ্ছি কাল তাদের দেখতে নাও পেতে পারি তবুও কেন এত দ্বন্দ্ব! জীবনের সব দ্বন্দ্বই সময়ে মিটিয়ে ফেলা ভাল।"

প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেলায় যেমন একটা মন খারাপের আবহ বিরাজ করে, এখন যেন সেরকমটাই হইল। নিঃশব্দে রাত্রের আহার সমাধা হইল। একে অপরকে শুভরাত্রি বলিয়া সকলেই শয্যাগ্রহণ করিলাম।

অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম চেন্নাই পৌঁছিয়াছি, সকলেই নামিবার জন্য প্রস্তুত। আমিও তৎপর হইলাম। অতঃপর বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যে যার গন্তব্যে গতি করিলাম। আমার গন্তব্য অবশ্য বাঙ্গালোর অবধি। এই বারের যাত্রা এরূপেই সমাপ্ত হইল কিন্তু রেশ রহিয়া গেল, সেই সঙ্গে একটা খটকাও।

কয়েকদিন পরের কথা, আমি ব্যাঙ্গালোর হইতে ফের চেন্নাই আসিয়াছি আমার এক নিকট আত্মীয়কে দেখিতে, সে এখানকার একটি বিখ্যাত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যে মারণ ব্যাধিতে সে আক্রান্ত সেই মারণ ব্যাধিটির সুচিকিৎসা এখানে হয় বলিয়া কথিত। এই স্থানে বাবলিকে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যাহার অবিলম্বে চাকুরিতে যোগ দিবার কথা সে কেন এই স্থানে আসিবে! কৌতূহল বড় বিষম বিষয়। কৌতুহল নিবৃত্ত করিবার জন্য বাবলির সহিত কথা বলিতেই হইল। সে আমাকে সহযাত্রী হিসাবে চিনিতে পারিল এবং যাহা ব্যক্ত করিল তাহা এইরূপ—নবকান্ত আপন কথা বলিবার সময় কিছু হেঁয়ালি ভরা কথা বলিয়াছিল যেমন রহস্যময় দেশে যাইবার কথা, দিনক্ষণের বিষয়ে এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা। এই সমস্ত কথা বাবলির মনে কিছু সংশয়ের জন্ম দিয়াছিল। রেল স্টেশন হইতে বাহির হইয়া উভয়ে একটি ট্যাক্সি হায়ার করিয়া গন্তব্যে রওনা দিয়াছিল। পথিমধ্যে যে হোটেলের নিকট নবকান্ত নামিয়া গিয়াছিল তাহার খুব নিকটেই এই হাসপাতালটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বাবলির সংশয় দৃঢ় হয়। সেইহেতু পরবর্তীতে বাবলি হাসপাতালে আসিয়া আবিষ্কার করে যে নবকান্ত প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার নিমিত্ত এই স্থলে আসিয়াছে। তাহার শরীর একটি অর্বুদের সঞ্চার হইয়াছে। স্থানীয় চিকিৎসায় অর্বুদটিকে কর্কটের বীজ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া নবকান্তের নিদান হইয়া গিয়াছে। ঐটির সত্ত্বর অপারেশন দরকার কিন্তু একাকী আসিয়াছে বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। অতঃপর বাবলি নিজের আঙ্কলের গুরুতর অসুস্থতার কথা বলিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কয়েকদিনের সময় মঞ্জুর করিয়া লয়। শেষে নিজে নিকট আত্মীয়ের ভূমিকা লইয়া সমস্ত বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে সহায় করিয়াছে। অপারেশন সফল হইয়াছে।

বাবলির কথা শুনিয়া প্রথমে একটু কৌতুক বোধ হইয়াছিল কারণ 'মেডিক্যাল এক্সপ্রেস', 'রোগীর সঙ্গে একত্রে যাত্রা' ইত্যাদি কথা তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম অথচ সে জানিতেও পারে নাই যে, সে এক রোগীর সঙ্গেই যাত্রা করিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত করিতে ইচ্ছা হইল। পুরুষ জাতি হিসাবে নিজেকে ধিক্কার দিতেও ইচ্ছা হইল। এইরূপ সাহসী, উদার উচ্চ চিন্তার মেয়েদের প্রতি আমরা পুরুষরা কতইনা দুরাচার করিয়া থাকি।

ট্রেনে আরোহণ করিয়া উহাদেরকে পিতাপুত্রী বলিয়া ভ্রান্ত অনুমান করিয়াছিলাম কিন্তু বাবলি তাহা অভ্রান্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিল।

রিপ্রেজেন্‌টিভ

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

দশ ফুট বাই দশ ফুটের একটা ঘর। তাতেই দুটো খাট। ছোট্ট প্যাসেজে রান্নার ব্যবস্থা, সামনে টানা খোলা বারান্দা। পরপর পাঁচ-ছটি ঘর, প্রত্যেকটি ঘরে একেকটি পরিবার। সকাল সকাল অল্প কিছু মুখে দিয়ে নেয় সুপ্রতীম। সারাদিনে আর কি জোটে কি জোটে না। চটের ব্যাগ দুটো হাতে নিয়ে পলেস্তরা খসা দেওয়ালে, ঝুলে ভরা দূর্গার ছবিতে প্রণাম করে হাঁক পাড়ে সুপ্রতিম—"মা আসছি।"

"সাবধানে যাস বাবা"—পেছনে মা, নোংরা নোংরা শাড়িতে হাত মুছে এসে দাঁড়ায়। করার কিছু নেই। এত সামর্থ্য নেই যে রোজ রোজ দামি সাবানে কাপড় ধুয়ে ফেলবে। ব্যাগ হাতে স্টেশনে এসে দাঁড়ায় সুপ্রতিম।

পড়াশুনায় খারাপ ছিল না সুপ্রতিম। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করতেই বাবার প্রাইভেট ফ্যাক্টরির কাজটা গেল। কমার্স নিয়ে পড়েছিল সে। খুব ইচ্ছে ছিল কাঁধে দামি ব্যাগ নিয়ে নামি কোম্পানির রিপ্রেজেন্‌টিভ হবে সে। এত প্রফেসন থাকতে তার এই প্রফেসনটাই খুব পছন্দের ছিল। রিপ্রেজেন্‌টিভ সে হয়েছে, তবে তার ইচ্ছার বিষয়ে নয়, একটা কোম্পানির চানাচুর বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে বের হয় সকাল হলে। বাবার সামান্য টাকায় সংসার চলা অসাধ্য ছিল। তাই এই কাজটা একজন তাকে বলতেই সে লেগে পড়েছিল। পোঁ করে কানের কাছে ট্রেনের হর্ন বাজতে চমকে ওঠে, সবার সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ে ট্রেনে। আজ দুর্গাপুর যাবে। এই ট্রেনে যেতে যেতে প্রায় অনেকেই চেনা মুখ হয়ে উঠেছে। বাদলদা বলে—"আজ কোন দিকে ভাই।"

"দুর্গাপুর যাব গো। একটু বেশি মার্কেট ধরার জন্য বলছে মালিক। সেল না বাড়ালে চেঁচামেচি করছে।"

বিচ্ছিরি একটা খিস্তি দিয়ে বাদলদা বলে—"শালাদের যতই থাক তবু আরও আরও করে প্রাণ দেবে। এই সুপ্রতিম বিড়ি খাবি।" বিড়ি বার করে বাদল। সুপ্রতিম লজ্জা জড়ানো গলায় বলে—"এমা তুমি আমার দাদার মতো।"

"মোতো-দাদা তো নাইরে বাপু। বড় লোকদের ঘরে দেখিস না বাপ ছেলে জামাই একসঙ্গে বসে ঢুক ঢুক করে মাল খায়। আর আমরা তো এই রাস্তার দাদাভাই নে-নে খা একটা।'

নেশা করে পয়সা নষ্ট করার পয়সা তার নেই তাই সুপ্রতিম এসব এড়িয়ে চলে। কথায় কথায় দুর্গাপুর এসে পড়ে। সুপ্রতিম নেমে হাঁটতে শুরু করে। এফসিআই-এর পাশ দিয়ে ঢুকে যায় সাগরভাঙা গ্রামে। ওখানে বেশ বড় বড় কয়েকখানা দোকান হয়েছে। ওখানে মাল দিয়ে ফেরার পথ ধরে। বৈশাখের ঠা-ঠা দুপুর। সারা রাস্তা জুড়ে ঠান্ডা পানীয়ের দোকান, দেখে দেখে তেষ্টা টা দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে। গলার ভেতরে মরুভূমির অনুভূতি। রাস্তার কলটাতে জল নেই। খানিকটা এগিয়ে একটা দোকানে দাঁড়ায়। শুধু জল চাইতে খুব লজ্জা হয়। পেটের ভেতর অবশ্য খিদের দাপাদাপি। একটা মিষ্টি চায় সুপ্রতিম সেটা খেয়ে বেশ কয়েক গ্লাস জল খেয়ে নেয়। খিদের সময় জলটা বেশ কাজে দেয়। স্টেশনে এসে একটা বেঞ্চে বসে। এরপর চিন্তা করে এরপর কোন দিকে যাবে। অণ্ডালে নেমে তারপর রানিগঞ্জও যাবে ঠিক করে। মিনিট পনেরো পরে লোকাল ট্রেন স্টেশনে ঢোকে। যথারীতি ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনে পা রাখা, তবে সৌভাগ্যবশত জানালার পাশে একটা সিট পেয়ে যায়। সুপ্রতিম গুছিয়ে বসে, ট্রেন গতি বাড়ায়। হঠাৎ ওয়ারিয়ার কাছে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ে। লাইনের গণ্ডগোল, ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে। একবার ভাবে নেমে রাস্তা থেকে বাস ধরে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু পরিশ্রমের কথা ভেবে বসে থাকে। বিশাল শরীরে নির্জীব দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। বেলা বাড়ছে। প্রায় প্যাসেঞ্জার নেমে স্টেশন চত্বরে গিয়ে

বসে। সুপ্রতিমের পেটেও খিদের জ্বালা। তবুও মনটাকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়ে সেই জ্বালা ভুলতে চাইছে। খবর পাওয়া গেল ট্রেন ছাড়তে আরও অনেকটা দেরি হবে। ঘড়ির কাঁটা দুপুর ছড়াচ্ছে। সুপ্রতিম প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে থাকে। আবার গিয়ে বসে। খিদে সহ্যাতীত হতে দুটো কচুরি কেনে খাবে বলে। খাবারটা নিয়ে একটা বেঞ্চে বসে। চোখ চলে যায় কোনার ডাস্টবিনটার দিকে। অনেকক্ষণ ধরে একটা বয়স্ক ভিখিরি খাবার চেয়ে চেয়ে ঘুরছিল সঙ্গে একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা। কেউ কিছুই দেয় না। সুপ্রতিম তার খাবারটা মুখে পুরতে যাবে সেই সময় একজন যাত্রী তার খাবার খেয়ে পাতাটা ওই ডাস্টবিনে ফেলে। বাচ্চাটা পাতাটা হাতে তুলে নেয়। দ্রুতগতিতে ছুটে আসে বয়স্ক ভিখিরিটা। বাচ্চাটার হাত থেকে পাতাটা বলপূর্বক কেড়ে নিতে চায়, বাচ্চাটাও দিতে নারাজ। বুড়োটা সজোরে থাপ্পর কষায় বাচ্চাটার গালে তারপর পাতাটা কেড়ে খাবারের অবশিষ্টাংশ চেটে চেটে খেয়ে ফেলে। বাচ্চাটা চোখের জলে বুক ভেজায়। এই দৃশ্যটা কেউ বা তাড়িয়ে উপভোগ করে, কেউ ফিরেও তাকায় না। সুপ্রতীমের বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। হাতের খাবারটা তেঁতো লাগে। সে বোঝে ক্ষিদের জ্বালাটা কি। উঠে গিয়ে মেয়েটার হাতে ওর খাবারটা ধরে দেয়। আর পিছু ফেরে না। এদিক ওদিক থেকে দু'একজন বলে ওঠে—"বাবা দাতাকর্ণরে।" সুপ্রতীম ওদের বোঝাতে যাবে না এর অর্থটুকু। কলের কাছে গিয়ে জল খেয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে নেয়। ট্রেনে উঠে বসে। কিছুক্ষণ পরে নড়ে ওঠে ট্রেন, তারপর প্ল্যাটফর্ম ছাড়ে। রানিগঞ্জে এসে নামে সে। শেষ বিকেল, তাড়াতাড়ি চেনা দোকানে মালগুলো দিয়ে নেয়। এবার সোজা বাড়ি যাবে। স্টেশনে আসে। মনটা সেই ঘটনার জন্য এখনও ভারি হয়ে আছে। ও চিন্তা করে, কি বিচিত্র এই দেশ, তার চেয়ে বিচিত্র মানুষের মন। এই হাহাকারের যুগে ইঁদুর দৌঁড়ে সামিল হয়ে মানুষগুলো যেন যন্ত্র হয়ে গেছে। বিবেক, ভালবাসা, মানবিকতা শব্দগুলো শুধু বাংলা অভিধানে রয়ে গেছে। হয়ত সবাই তার লক্ষ্যে পৌঁছবেনা, কেউ পৌঁছবে তবু ছুটে চলেছে, ছুটেই চলেছে।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে সংগ্রামে এত ব্যস্ত মানুষ যে তার পাশের মানুষটির অস্তিত্ব ও অনুভব করে না। আরও আরও অর্থ চাই সুখ কেনার জন্য, আসলে পৃথিবীতে সব কিছুই কেনা সম্ভব, সম্ভব নয় কেবল সুখটাই। তাহলে প্রতিটি ধনী ব্যক্তি সুখের চাদরে মোড়া থাকত, আবার ছুটে চলত না আরও সুখের আশায়। সুখ হল মনের ধন তাকে কখনই কেনা যায় না।

ট্রেন আসে, সেও চেপে বসে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। বাড়ি ফেরার নামে এক অনির্বচনীয় আনন্দ হয়, ওখানে দুটো স্নেহকোমল হৃদয় তার অপেক্ষায় সময় গোনে যে। ট্রেনের গতির সঙ্গে সুপ্রতীমের মনের গতিও বেড়ে ওঠে। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। দূরে ছোট দুটো গ্রাম চোখে পড়ে। গ্রামের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া উঠছে। ঝুপড়ি ঘর আর তার থেকে আসা ধোঁওয়া দেখে সুপ্রতীমের একটা কবিতা মনে পড়ে যায়।

"গোল পাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া
সকালে সন্ধ্যায় উড়ে যায়—মিশে যায় আম বনে
কার্তিকের কুয়াশার সাথে।"

জীবনানন্দের কবিতা। যদিও মাসটা কার্তিক নয় তবু মনে পড়ে গেল। সে খুব ভাল আবৃত্তি করত। পাড়ায়, বাইরে আবৃত্তিতে প্রথম সে হতোই। তবে আবৃত্তি করার চেয়ে কবিতা পড়তে বেশি ভালবাসত। কবিতার সূত্র ধরেই একদিন তার জীবনে কস্তুরির আগমন ঘটে ছিল। দু'জনের জীবনে তখন রঙিন বসন্ত, উচ্ছল-উদ্দাম যৌবন। গ্রামের মাঠের গাছতলায়, নদীর ধারে বসে থাকত তারা আর বুনে যেত রঙিন স্বপ্নের জাল ভবিষ্যৎ জীবনের। সুপ্রতীমের কোলে মাথা রেখে বসে থাকত কস্তুরি। অসম্ভব কবিতা শুনতে ভালবাসত। কস্তুরির আবদারে তাকে একটা কবিতা বারে বারে বলতে হত। কস্তুরির হাতটা নিজের হাতে নিয়ে সুপ্রতীম বলে

যেত—"পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোন খানে—সফলতা শক্তির ভিতর।

কোন খানে আকাশের গায়ে রুর মনুমেন্ট উঠিতেছে জাগি,

কোথায় মাস্তুল কুলে জাহাজের ভিড় লেগে আছে মেঘে,

জানি নাকো,—আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর।"

কবিতা শেষে দু'জনে বিভোর হয়ে বসে থাকে। সুপ্রতীম বলে—"কস্তুরি তুমি সারাজীবন এমনই থাকবে তো। আমি অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে, তবে স্বপ্ন দেখি একদিন বড় হব। সেই বড় হবার আগে পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তো কস্তুরি।" সুপ্রতীমের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে কস্তুরি বলত—"আবার সেই কথা, বলতে মানা করেছি না।" কিন্তু সেই কথাটাই সত্যি হল। কস্তুরি বড় ঘরের মেয়ে বড় কলেজে ভর্তি হল। পালটাতে শুরু করল তার জীবনধারা। টিউশনি করে নিজের পড়া টিকিয়ে রাখতে ব্যস্ত যখন সুপ্রতীম, কস্তুরি তখন কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে হইচই করে জীবন কাটাতে কাটাতে দূরে সরে যাচ্ছে। এরপর সংসারের ভাঙা হালটা ধরতে যখন তাকে বাধ্য হয়ে এ কাজটা করতে হল সেদিন কস্তুরি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। বলে—"এ কি যাতা কাজ করছ সুপ্রতীম। বন্ধুদের কাছে আমার মাথা নীচু হয়ে গেল। এভাবে তুমি জীবনে দাঁড়াতে পারবে?"

"আমি পারব কস্তুরি, শুধু তোমার একটু সহযোগিতা, একটু ভালবাসা দরকার। তুমি দেখ আমি একদিন খুব বড় কোম্পানির রিপ্রেজেন্টিভ হব, তখন তোমার সব লজ্জা এক লহমায় চলে যাবে।" বলে সুপ্রতীম।

হয়না, বহু বহু প্রচেষ্টাতেও ভাল কাজ জোগাড় করাতে পারেনা সুপ্রতীম। কস্তুরি একদিন স্পষ্টতই জানায়, "সুপ্রতীম জীবনটা কিন্তু স্বপ্ন দিয়ে চলে না। আমি এখন সেটা ভাল করে বুঝেছি। সেদিনের সেই শপথের মাঝে দুটি অপরিণত মন ছিল। আজ বাস্তববুদ্ধি দিয়ে যখন বিচার করছি তখন মনে হয়েছে স্বপ্ন নয়, স্বাচ্ছন্দ্য নয়, স্বাচ্ছন্দ্য হল জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আসল বস্তু। এটাই জীবনে কাম্য।"

সঞ্জয়ের হাত ধরে চলে গেছে কস্তুরি তার সব ভালবাসাকে পায়ে ঠেলে। ট্রেন থামার ঝাঁকুনিতে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসে মন। ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে থাকে বাড়ির পথে। আজ সারাদিনের নানা ঘটনায় আর অতীতের সেই পীড়াদায়ক চিন্তা তার দেহকে অবসন্ন করে তুলেছে। ঘরে ফিরে স্নান করে, কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়ে সে। মা তাকে আর বিরক্ত করে না।

পাখির ডাকে ভোর ঘুম ভাঙে। দরজা খুলে বাইরে আসে সুপ্রতীম। সামনের বাঁশবাগানের মাথা থেকে ভোরের সূর্য সবে উঁকি দিচ্ছে। একটা নতুন সকাল, একরাশ নতুন আশা। সকালের কমলা সূর্যের দিকে তাকিয়ে সুপ্রতীম ভাবে তার সামনে দিয়ে একটা মস্ত বড় মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে, ওই সূর্যের দিকে। তার মত না পাওয়া, স্বপ্ন হারা একদল মানুষ, কিন্তু আশাহত নয় তারা। তাদের সামনে ওটা কে? ঠিক, সুপ্রতীম নিজেই তো। দামি জুতো জামা, দামি ব্যাগ কাঁধে নামি কোম্পানির রিপ্রেজেনটিভ। ওদের সবার দুঃখের রিপ্রেজেনটিভ হয়ে সত্যের পথে এগিয়ে চলেছে। বলছে "এসো এগিয়ে এসো সবাই। ভেঙে পোড়ো না। একদিন আমাদের জীবনের দুঃখের রাত কাটবে, এমনি করে নতুন সূর্য উঠবে। অতএব ভয় নয়, দুঃখ নয়, হতাশা নয়, এগিয়ে চলো।

মুষ্ঠিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে সুপ্রতীম গেয়ে ওঠে—

আমরা করব জয়—আমরা করব জয়

আমরা করব জয় নিশ্চয়...

অফিস অফিস

অরুনাংশু চট্টোপাধ্যায়

সামনে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল শেখর। তারপর নিজের মনেই বলল, 'মাই গড! বারোটা পনেরো!'

টেবিলটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। পাশেই একটুকরো আয়নায় নিজেকে এক ঝলক দেখল। মাথার চুলটায় আঙুল চালিয়ে নিয়ে গোঁজা জামাটা টেনে ঠিক করে নিল। এটা তার অভ্যাস। একটু ফিটফাট থাকতেই সর্বদা পছন্দ করে। চেয়ারটাকে পায়ে করে একটু পিছন দিকে ঠেলে একটা প্যাসেজ তৈরি করল ও সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল।

এই বড় মতো হল ঘরটায় একাই বসে। অফিসের এই ঘরটায় আরও তিনজন বসে কাজ করত। তখন বেশ জমজমাটি ছিল এখানটা। তারপর দু'জন রিটায়ার হল। একজন ট্রান্সফার হয়ে গেল। এখন শেখর একা। মানে এই ঘরের টেবিলের কাজ সে একাই সামলায়। দেখে মনে হয় বেশ চাপে রয়েছে। তাই মনে হয় মুখটা তার কাঁচুমাচু।

সে এখন অফিসের বড়বাবু। র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী তাপসও আর একজন দাবিদার বড়বাবু হবার। একই ডেজিগ্‌নেশন দুজনে হোল্ড করছে। তারা দুজনেই এখন সিনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট পদে। কিন্তু তাপস হতে পারেনি। কারণটা কানাঘুষো শোনা যায়, অফিসারদের সু-নজরে শেখর রয়েছে। তাই কাজ চালানো গোছের কাজ করেও সে স-সম্মানে উতরিয়ে যায়।

অফিসে এখন নতুন কালচার চলছে। অফিসারদের মুখের উপর কথা বলার চেয়ে শুনতে হবে মুখ বুজে। বললেই বদলি। মনে হয় সেই রকম বদলির কিছু অর্ডার এসেছে ডিপার্টমেন্টে। এক্ষুণি বাইনেম ইসু না করলে তারই বদলি করে ছেড়ে দেবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তাই শেখরের মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে রয়েছে।

অতএব সে এখন চলল ইসু-রিসিভ সেকশনে। ছুটে এল ছোট্ট একটা ঘরের ভিতর। এটাই ইসু-রিসিভ ডিপার্টমেন্ট। মান্না সামলায়। তার পুরো নাম কুনাল মান্না। ডেজিগ্‌নেশন জুনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট।

—কিরে ট্রান্সফারের অর্ডারগুলো ইস্যু হল? শেখর প্রশ্ন করল তাকে। সে এখন মান্নার টেবিলের সামনে। ঘাড় নেড়ে মান্না জানাল হয়নি।

ব্যস্তভাবে শেখর তার হাত ঘড়িটা দেখল। মান্নাকেও দেখাল। তারপর চোখ নাচিয়ে বলল, 'সামান্য কাজটায় এত দেরি হচ্ছে? তুই না পারলে বল আমি করে নিচ্ছি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ তো আমাকেই করতে হয়।

—তোমার এত তাড়া কিসের শেখরদা? স্ব-ইচ্ছায় তো আর কেউ যাচ্ছে না। দেরি করেই যদি অর্ডার ছাড়া হয়। তাতে তোমার ক্ষতিটা কি হবে শুনি?

মান্নার চাঁচাছোলা কথা।

শুনে শেখরের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

সে বেশ মেজাজ নিয়ে মেজাজ হারানো গলায় বলল, 'এই সব নেতাগিরি ইউনিয়নে মারাবি। আসল জায়গায় তো চুপসে থাকিস। এতগুলো অর্ডার যে ইস্যু হল তখন তোরা কোথায় ছিলি শুনি? আমায় যদি কথা শুনতে হয় তাহলে তোর কপালেও দুঃখ রয়েছে। মাইন্ড ইট।'

—দেখ শেখরদা ইউনিয়ন তুলে কথা বলবে না। পাঁচ বছর পর তো রিটায়ার করবে। এখনও পর্যন্ত তুমি

কোন ইউনিয়ন কর তাই কেউ বুঝতে পারল না।

—আমার ও-সবের দরকার পড়ে না। ফাঁকিবাজরাই ও পথে হাঁটা দেয়।

—তাই নাকি? কে ফাঁকিবাজ তা সবাই জানে। তা বিপদে পড়লে তেল মাখাতে আস কেন? তোমার পেয়ারের অফিসার ধরলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তারা তখন পাত্তা দেয় না বুঝি?

—বাজে বকিস না। তোরও ট্রান্সফার ঝাড়গ্রাম হয়ে যেতে পারে। সেটা জানিস?

কথাটা শুনে মান্না বিকট একটা হাসল। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। শেখরের চোখের কাছে আঙুলটা নিয়ে গিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, 'কে করবে ট্রান্সফার তুমি? এত ক্ষমতা? তাহলে দেখাও দেখি।'

—আমি কেন করতে যাব। যাদের কানে উঠলেই হবে তারাই করবে। এটা তুইও ভালোই জানিস।

—আর এটাও জানি তাদের কানে তোলার জন্য তুমি আছ। তা আজকেই তাদের কানে উঠবে না কালকে নাকি পরশু। বলেই মান্না হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকল।

—দাঁত না কেলিয়ে যা বললাম তাই কর। মনে রাখিস আমি তোর থেকে সিনিয়র।

—খিস্তির সময় মনে থাকে না সেই কথাটা। যান তো নিজের টেবিলে যান। আমার সময় হলে নিশ্চয়ই করব। আমার অন্য কাজ রয়েছে।

—মানে? এটা কাজ নয় বলে তোর মনে হচ্ছে? আধ ঘণ্টার মধ্যে ইস্যু নাম্বার ফেলে অফিস কপি আমার টেবিলে দিবি। আর হ্যাঁ। পিয়ন বুকে তুলে অর্ডারগুলো বাইনেম পৌঁছানোরব্যবস্থা করে সেই রিপোর্টও দিবি। বি কুইক।

টেবিল চাপড়ে কথাগুলো মেজাজের সঙ্গে বলে গেল বড়বাবু শেখর।

চলে যাবার জন্য পিছন ফিরতেই মান্না তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ শেখরকে রক্তচক্ষু দিয়ে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বলল, 'আমার ইউনিয়ন এরকম বেআইনি ট্রান্সফার মানে না। আমি কথাটা বললাম বটে। জানবে এটাই ইউনিয়ন পক্ষেরও বক্তব্য। আজ এটা নিয়ে ডেপুটেশন হবে দুপুর দু'টোয়। রেজিস্টারের অফিসে। তাই কোনো অর্ডার ইস্যু আজ করা যাবে না।'

আহত বাঘের গায়ে যেন নুন লঙ্কা পড়ল। সে এবার আরও যেন ভয়ানক হয়ে উঠল। কোনো উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল তার ঘর থেকে। শেখর বোধহয় মনে মনে ভাবল, যা করবার মেঘের আড়াল থেকে করতে হবে। তার চোখে শুধু এখন প্রতিহিংসার স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠল। চোখ দু'টো চকচক করতে লাগল।

টেবিলে ফাইলের পাহাড়। শুধু বুক থেকে মুখটা দেখা যাচ্ছে তাপসের। কম্পিউটার নিয়ে বসে রয়েছে। তারই একফালি জায়গা দিয়ে শেখরকে হন্তদন্ত হয়ে যেতে দেখল। চেঁচিয়ে ডাকল, 'এ্যাই শেখর। কি ব্যাপার এখানে?'

—সারাক্ষণ কম্পিউটারে কি করিস বলত? বলে শেখর এগিয়ে গেল তাপসের টেবিলের দিকে। তারপর বলল, 'ও তাস! ভালো। ভাবলাম কত কিনা কাজ করছিস!'

তাপস ঠোঁট উলটে বলল, 'ঘুরে ঘুরে এর খবর ওর খবর নিয়ে কি লাভ? ওটা মেয়েদের কাজ। লাগান ভাঙান না কি যেন বলে? আমি নিজের চরকায় তেলটা দিই। তাই চেয়ারেই থাকি। কাজ না থাকলে সময় কাটাই তাস খেলে। অফিসারদের তেল দেওয়া আমার কাজ নয়। যাক ওসব কথা। কি ব্যাপার তুই এখানে?

—আরে শালা কি যুগ এল। ছোট বড় মানা মানি নেই? আমার সাবঅর্ডিনেট সে কিনা আমায় ধমকায়!

শেখর সমস্ত ঘটনার কথা তাপসকে বলল।

তাপস হাসতে হাসতে শেখরকে দেখতে লাগল। সেই মসকরা মেশানো হাসি নিয়েই তাকে বলল, 'তুই বড়বাবু, তোকে এমন বলছে? আমাদের কি হবে রে ভাই!'

বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল শেখর। তাপস বলে চলল, 'লিডিং ইউনিয়নে থেকেও ট্যাঁ ফুঁ করার সাহস আমাদের নেই। তবু তো ওরা ফোঁস করছে। এটা ভালো ইঙ্গিত। এটা ওদের প্লাস পয়েন্ট।'

—তাও যদি সেক্রেটারিয়েট মেম্বার হত! বরাহনন্দন তো একজিকিউটিভ মেম্বার। তাতেই এত দম?

—ভুল করছিস। প্রতিবাদে সবাই সমান। দমটাই আসল। সেটাই তো ডেমোক্রাসি। তবে আর ক'দিন যেতে দে। তারপর জাদুঘরে থাকার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে ডেমোক্র্যাসি।

—তোরা শালা নেতারা কোন জাতের সেটাই বুঝি না। বিরোধীদের তোরা প্রশংসা করছিস! ব্যাপারটা কি?

শুনে তাপস হাসতে লাগল। তারপর গম্ভীর ভাবে হাত দু'টো কচলাতে থাকল। একটু ভেবে আবার বলতে আরম্ভ করল।

—দেখ বেআইনি ট্রান্সফার তোরও হতে পারে আমারও হতেপারে। মুশকিল হল এসব নিয়ে আমরা সরাসরি কিছু বলতে বা করতে পারব না। একটা বাধ্য বাধকতা থাকে। ট্রেড ইউনিয়নটা এমনই হয়। তুই ওসব বুঝবি না। শুধু জেনে রাখ সমস্ত কর্মচারীদের স্বার্থ জড়িয়ে। তাদের স্বার্থের জন্য লড়াই করে চলেছে একটা দল। এই লড়াইয়ে তোর আমার সকলের সামিল হওয়া দরকার। নিরপেক্ষ লাগাতার লড়াই চাই বুঝলি। বুঝিয়ে দিতে হবে লড়াই আন্দোলন কাকে বলে। ফ্যাসিবাদি মনোভাব চলবে না।

—ধ্যুততেরি। তোর লেকচার রাখ। মঞ্চে দিলে তোর কাজে আসবে। আমাকে অপমান। ওফ্ গা-টা রি রি করছে। আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছি। তার মধ্যে কাজ না হলে এমন ঠেলা লাগাব না। শালার নেতাগিরি ছুটিয়েই ছাড়ব।

তাপস একটু হাসল। ফেলুদার মতো ভীষণ সাহেবি কেতায় অথচ লালমোহনবাবুর মতো ক্ষীণ গলায় বলল, 'সাইবেরিয়া কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার। অ্যাট দ্যা পিরিয়ড অফ স্ট্যালিন টু ব্রেসনেফ।'

শেখর অবাক চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কিছু বললি আমাকে?'

তারপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। দু'বার চা খাওয়া হয়ে গেছে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে শেখর। এখনও অফিস কপি তার টেবিলে এসে পৌঁছায়নি। যা অপমানিত হতে হয়েছে তা ভুলে যাবার নয়। এখনও তাই হয়ে চলেছে। তার ধারণা ইচ্ছে করেই এমনটা করছে মান্না। এর প্রতিশোধ একটা নিতেই হবে। না হলে মাথায় চেপে বসবে। মোবাইলটা বার করল। সেভ করা নম্বরটা ডায়াল করল। নরম সুরে কথা বলতে লাগল।

—স্যার আমি শেখর বলছি। হ্যাঁ সাড়ে দশটায় অর্ডারগুলো মান্নার টেবিলে দিয়ে দিয়েছি।

—না স্যার। কোথায়? এখন পর্যন্ত একটাও ইস্যু হয়নি। আমায় দোষ দেবেন না স্যার। জানি না, তবে দু'টোয় আপনাকে ডেপুটেশন দেবে ওদের ইউনিয়ন। তারপর ঠিক হবে ওগুলো ইস্যু হবে কি না।

—বুঝুন স্যার। এ তো আপনার অর্ডারকে ভায়োলেট করা! এর জন্য ওর শাস্তি হওয়া উচিত নয় কি স্যার। নাম? মান্না, কুনাল মান্না। জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট। এত সাহস! বলে কি না এটা ইল্লিগ্যাল ট্রান্সফার অর্ডার। আমরা মানি না!

—দেখান দেখান। যাই হোক আমার নাম নেবেন না স্যার। ঝাড়গ্রামের ঝাড়টা এবার দিয়ে দিন। ওক্কে আমি চারটের সময় যাব আপনার কাছে। আমি দুটো পর্যন্ত টাইম দিয়েছিলাম। মনে হয় ওর টাইম এন্ড গেম ইস ওভার। পার্সোনাল ফাইলটা আনিয়ে দু কলম... । হ্যাঁ স্যার। আগে শোকজ পরে... ।

মুখের হাসি আর থামে না শেখরের। নিজের মনেই বলল, 'ব্যাটা আমার পিছনে লাগা। ইললিগ্যাল ট্রান্সফার তোর হবে। আমার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো। এবার দেখি বাছাধন তোদের ইউনিয়নের কত ক্ষমতা।'

এই ঘটনার পর অনেক দিন কেটে গেছে। শরত গেছে। শীতও গেছে। এখন বসন্ত চলছে। এক বসন্তের

বিকাল। ঝাড়গ্রামে কোনো এক গ্রামের পুকুর পাড়ের বাঁধান ঘাট। তার পাশেই পলাশ গাছের মাথায় যেন ইতস্তত আগুন লেগে রয়েছে। ঝরা ফুলে গাছের তলাটা যেন প্রেমের মায়াজাল বিছিয়ে সাজিয়ে রেখে কারও জন্যে অপেক্ষায়মান। প্রকৃতির মখমলি ভূমিতে বসে প্রেম করার জন্য যেন সর্বনাশা বসন্ত কপোত কপতিকে হাতছানি দিচ্ছে। সামনেই একটা মস্ত পুকুর। পুকুরের কিছুটা অংশে আত্মঘাতী পলাশ ফুলের পাপড়ি জলের তরঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। যেন নব বসন্তে যৌবনের জ্বালায় পরান উথাল পাথাল করছে তাদের। জল তরঙ্গের সাথে পাল্লা দিয়ে সুঠাম বক্ষদ্বয়ের মতো ফুলগুলো উঠছে আর নামছে।

দু'জন কপোত কপোতী ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে পুকুর পাড়ে। তার মধ্যে একজন ঢিল ছুঁড়ে চলেছে পুকুরে। তারফলেই জলের লহর ফুলকে ছুঁয়েছে। অন্যজন কাঁধে হাত রেখে বসে রয়েছে।

—মিঠু তুমি একাই এখানে চলে আসতে?

—কি করব? চাকরি কি ছাড়া যায়। সেই জন্যেই তো তোমায় ফোন করে জানালাম।

—জানতাম চেষ্টা করলেও তোমার ট্রান্সফার আটকানো যাবে না। কিন্তু নিজের ট্রান্সফার করাতে পারব। তাই আমিও এখানে আসার একটা প্ল্যান খাটালাম। জামতাম শেখরদাকে চটালেই কার্যসিদ্ধি নিশ্চিত।

—কি করে বুঝলে ঝাড়গ্রামেই ট্রান্সফারটা হবে?

—তুমি নিশ্চয়ই জেনে থাকবে ব্রিটিশ পিরিয়ডে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শাস্তি ছিল কালাপানি সেলুলার জেল। এখন উত্তরবঙ্গ বা ঝাড়গ্রাম। তবে উত্তরবঙ্গ এখন বিতর্কিত। তাই সেটা শেষের পথে। নিউলি সংযোজন ঝাড়গ্রাম ওপেন।

বলেই হাসতে লাগল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, —তোমার সঙ্গে আমার প্রেম চলছে ভাগ্যিস অফিসের কেউ জানে না। তাই কারো কোনো সন্দেহ হয়নি। জানলে হয়তো বেশ চাপে পড়ে যেতাম। ঝাড়গ্রাম যে সিলেবাসের ট্রেন্ড তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমার। এটা ভালই হল। কলকাতার থেকে শতগুণে ভালো এই জায়গাটা। নো পলিউশন। নো হট্টোগোল। টাটকা এয়ার। সর্বোপরি শেখরের মতো গাণ্ডু এখানে নেই। এবার বিয়েটা করেই ফেলব। তোমার কি মত? বলেই মিঠুর গালটা টিপে দিল মান্না।

—বাড়িটা আগে সেটেল করে ফেলতে হবে। তারপর বিয়ের রেজিস্ট্রি। আমার বাড়িতে সেটাই বলে রেখেছে। বাবা মা ভাই সবাই আসবে সাক্ষী দিতে। কুনাল তোমার মা বাবা আসবেন তো?

মিঠু এখন কুনালের হাত নিয়ে খেলতে ব্যস্ত।

—না। তারা আসবেন না। আমাদের যেতে হবে তাদের কাছে। যতই হোক তারা গুরুজন তো।

—কি? আমার বাড়ির লোকের কোনো গুরুজনত্ব নেই? মিঠু বলে উঠল।

তারপরেই হো হো করে হাসতে লাগল দুজনে।

হাত ধরে তারা হাঁটতে লাগল কাঁচা রাস্তার আল ধরে। গাছের ছায়াটা বেশ দূর পর্যন্ত পড়ে রয়েছে। সেই ছায়ার কোলে মিলে যেতে লাগল দু'টো হবু নবদম্পতি। দিগন্তে লাল আবিরের খেলা। বসন্তের লাল সূর্যের আর পলাশের লাল আভায় গোধূলিও যেন নব পরিণীতা। লাল চেলিতে নব বধূর সাজে। তাই মনে হয় এটাকে কনে দেখা বিকালও বলে। গোধূলিবেলায় সত্যিকারের কনে দেখা এবার সম্পূর্ণ হল।

অলৌকিক-এর সন্ধানে

অয়ন দাস

আমার মেয়ের শরীর তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে গেলাম। ঝুঁকি নিয়ে বৈষ্ণদেবী যাত্রাটা কি ঠিক হচ্ছে। সকাল থেকেই মেয়েটার জ্বর। যাব কি যাব না—ইতস্তত করছিলাম। আমার সহযাত্রীরা যখন একযোগে বলে উঠল—'বৈষ্ণদেবী দর্শন কি আর সবার ভাগ্যে হয়!'—তখনই কেমন যেন জেদ চেপে গেল।

রাত ন'টা বাজে। আমরা হেঁটে চলেছি খাড়াই পাহাড়ি পথ ধরে। পথের শুরুতেই ডুলি ওয়ালারা বসে ছিল। কিন্তু সাতহাজার টাকা খরচ করে ডুলি ভাড়া করার মুরোদ আমার নেই। কিছুদুর গিয়ে দেখলাম ঘোড়া ওয়ালারা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রুমা ঘোড়ায় চড়লো। ওর সামনে বসিয়ে দিলাম সোনাই কে। কিছুদূর যাওয়ার পর রুমা চেঁচিয়ে উঠে বলল—'আরে থামাও থামাও...আমি পারবো না...আমার কষ্ট হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে বসতে আমারও বেদম অস্বস্তি হয়। অতএব ঘোড়াকে বিদায় জানিয়ে জ্বর হওয়া মেয়েকে কোলে নিয়ে চড়াই ভেঙে পায়ে হেঁটে ওঠা শুরু করলাম।

অসংখ্য মানুষ আমার সহযাত্রী হয়ে উপরে উঠছেন। কেউ ডুলিতে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হেঁটে। কেউ আবার দণ্ডী কাটতে কাটতে। অজস্র মানুষের সঙ্গে নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আমিও যেন চলেছি এক অশেষ অনন্ত যাত্রায়।

আমার মেয়ের পাঁচ বছর বয়স। স্কুলে ভর্তি করেছি দু বছর হয়ে গেল। ও ভীষণই দুরন্ত। সারাক্ষণই শুধু দৌড়ে বেড়ায়। কতদিন ওকে কোলে নিইনি। ওর শরীরে এখন জ্বর। আমার ঘাড়ের উপর উষ্ণ নরম নিষ্পাপ মুখটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে ও। ওর শরীরের উষ্ণতা নিজের শরীরে শুষে নিয়ে ওকে চনমনে করে তুলতে ইচ্ছে করল আমার। মেয়েকে সেভাবে সময়ই দিতে পারি না। আমি ক্রমশ ওর থেকে দূরে সরে যাব হয়তো। ঠিক যেমন আমার বাবা আমার কাছে হয়ে গেছিলেন দূরের মানুষ। মেয়েকে আরো নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরলাম। হঠাৎই আমার বাবাকে ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করল আমার।

পথের দুপাশে অসংখ্য চটি। সেখানে বিক্রি হচ্ছে চা কফি স্ন্যাক্স। আর পারছি না। একটি চটিতে থামলাম। রুমা বলল—এক কাজ করি। আমি সোনাইকে নিয়ে হোটেলে ফিরে যাই। তুমি ঘুরে এসো। সারারাত মাথায় হিম লাগবে...যদি জ্বর আরো বেড়ে যায়!

বললাম—যদি ফিরতেই হয় সবাই ফিরবো। যদি যাই সবাই যাব। যা হবার হবে। চলো এগোই!

উপর থেকে বৈষ্ণদেবী দর্শন করে পরস্পরকে আশ্রয় করে নেমে আসছেন এক প্রৌঢ় দম্পতি। আমাদের দেখে বলে উঠলেন 'জয় মাতাদি'। আমরা পেরেছি, তোমরাও পারবে।

আমার মেয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সোনাই-এর ওজন খুব বেশি নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বিশাল এক বোঝা রয়েছে আমার কাঁধে। আমার ডানহাতটা কেমন যেন অসাড় লাগছে। পথ যেন আরো খাড়াই। বুকের মধ্যে যেন কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে। একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেছি। কতদূর...আর কতদূর?

মোট চোদ্দ কিমি রাস্তার মধ্যে এসেছি মাত্র আট কিমি। আরো অনেকটা দূর যেতে হবে। পারব...যেভাবে হোক আমাকে পারতেই হবে...আমি হারবো না...মন্দিরে গিয়ে পূজো দেবে রুমা...ওর বহুদিনকার শখ বৈষ্ণদেবী...আমাকে পৌঁছতেই হবে ওখানে।

আমার পাশে রণক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে রুমা। ওর সারা শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে। কপাল ও গাল থেকে অশ্রু বিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে ঘাম। অসম্ভব হাঁপাচ্ছে ও।

—কষ্ট হচ্ছে? তুমি পারবে?

—পারবো...ঠিক পারবো। চলো। ওখানে পৌঁছে রেস্ট নিয়ে নেব।

বহু...বহুদিন বাতে রুমার কেয়াফুলের গন্ধ মাখা ঘামে ভেজা শরীরটাকে ছুঁতে ইচ্ছা করল আমার। ভীষণভাবে পেতে ইচ্ছা করল ওকে। ঠিক যেমন ওকে পেতে ইচ্ছা কর—ও যখন আমার প্রেমিকা ছিল। বিয়ের পর সেই পাগল করা রোমান্টিসিজম...কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কত রাগারাগি...কত ঝগড়া...কত ভুল বোঝাবুঝি...

রুমার ঘামে ভেজা যুবতী শরীরটা নিজের মধ্যবিত্ত শরীরের কাছে নিয়ে এসে বললাম—ইয়েস! ইউ মাস্ট রিচ...উই মাস্ট রিচ...উই নেভার ফেল।

একসময় আর পারলাম না। বসে পড়লাম রাস্তার ধারে। দুজনে পাশাপাশি বসে—গভীর ঘুমে অচৈতন্য আমাদের সন্তানকে দুজনের কোলের উপর শুইয়ে দিলাম। জ্বরটা এখন অনেকই কম। আমার ডানহাতটা নাড়াতে পারছি না। বুকটা কেমন চাপ ধরে আছে। হালকা একটা পেইন হচ্ছে। রুমার পায়ে ক্র্যাম্প ধরেছে। ও খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

আমরা দশ কিমি উঠেছি। আরো চার কিমি উঠতে হবে। এই পথটা আরো খাড়াই, আরো কঠিন।

এক ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে নেমে আসছেন। ওনাকে দুজন লোক ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এত উঁচুতে উঠে হঠাৎ করে প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে ওনার।

—আমরা পারবো তো?

—পারবো...যেভাবেই হোক—পারতেই হবে।

—নামার সময় অতটা প্রবলেম হবে না, বলো!...উঃ আর পারছি না!

—এই তো এসে গেলাম...আর বেশিক্ষণ না

—সোনাইকে এবার আমার কোলে দাও। তুমি তো নিলে এতক্ষণ। তোমার শরীর...

—নাঃ তুমি পারবে না। চলো, আমি ঠিক আছি।

—ঠাকুর মেয়েটার জ্বরটা সারিয়ে দাও।

আমাদের সামনে দিয়ে নিজের পঙ্গু স্ত্রীকে পিঠের উপর নিয়ে এগিয়ে চলেছেন এক বৃদ্ধ। আরে! এভাবেও তো নিতে পারি। চলো! লেটস্ গো!

মেয়েটার জ্বরটা কমের দিকে কিন্তু ভয়ঙ্কর কাশছে। মেয়েকে পিঠে নিয়ে খাড়া পাহাড়ি পথ ধরে এক রহস্যময় আলোআঁধারির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলাম। আর কিছুক্ষণ বাদেই আমরা পৌঁছে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। তারপর পুজো দেব...তারপর...এক অদ্ভুত উত্তেজনা নিয়ে হাঁটতে থাকা আর শুধুই হাঁটতে থাকা।

একটা বাঁক নেওয়ার পর রুমা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। আর কয়েক পা হাঁটলেই আমরা পৌঁছে যাব মন্দিরে। সমস্ত মন্দিরটা অপরূপ এক আলোক মালায় সজ্জিত। রুমা আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমরা পেরেছি...আমরা পেরেছি...আমরা ফিরে যাইনি।

আমি হঠাৎ কেমন যেন স্থবির হয়ে গেলাম। ভীষণ অসহায় আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় লাগতে লাগল আমার। আমার মনে হল এতক্ষণ একটা আশা নিয়ে পথ চলছিলাম। সে আশা ছিল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আশা। সেই কাঙ্ক্ষিত স্থানে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটবার দুর্মর আশা। আমার এতক্ষণের হাঁটা যেন সেই অনন্ত

অপেক্ষার হাঁটা। কিন্তু এইবার? এইবার কি হবে? এইবার আমি কিসের প্রত্যাশায় বাঁচবো?

আচমকা আমার মনের গভীর গহন থেকে ওস্তাদ আমীর খাঁ-র ললিত রাগের মতো উদ্ভাসিত হল এক অচেনা উপলব্ধি। আমি বুঝতে পারলাম জীবনের সমস্ত চাওয়াই কখনও পেয়ে যেতে নেই। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন কখনও সফল হতে নেই। অসংখ্য না পাওয়া, অগুন্তি স্বপ্ন সফল না হওয়া এই মধ্যবিত্ত হেরে যাওয়া আমিটাকে বড্ড ভাগ্যবান মনে হল আমার। কত কিছু পাইনি বলেই, কত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি বলেই তো—কত কিছু পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে, কত লক্ষ্যে পৌঁছানোর রঙিন প্রত্যাশা নিয়ে হেঁটে চলেছি জীবনের বিপদসঙ্কুল পথে। সব কিছু পেয়ে গেলে, জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেলে—বড্ড অর্থহীন হয়ে যাবে আমার জীবন। বড়ো বেরঙিন হয়ে যাবে বেঁচে থাকা। তার চেয়ে এই ভালো। চোখ থেকে যদি স্বপ্নটাই হারিয়ে যায় তবে বেঁচে থেকে লাভ কি? অসংখ্য রঙিন আশা নিয়ে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে বেঁচে থাকার দুর্নিবার রোমাঞ্চ। সবকিছু পেয়ে গেলে সেই রোমাঞ্চ আর আনন্দটা মরে যায়।

মন্দির থেকে কিছুটা দূরে সিনেমার শেষ দৃশ্যের ফ্রিজ শট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

হৃদে বাহিরে অন্তরে প্রান্তরে

সুনৃতা মাইতি

ভোরের আলোর উদ্ভাস ক্রমশ স্ফুরিত হচ্ছে একটু একটু করে। নবগ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ অনেকটাই অন্তর্হিত এই সময়ে। বৈশাখী হাওয়ায় তমাল তরুদলে হিল্লোল। আম্র পল্লবে রেশমি হাওয়ার পেলব স্পর্শ। জনমানবশূন্য যমুনাপুলিন। এমন সময় নদীবক্ষে এ কার ছায়া? নদীতট সন্নিহিত কদম্ব বৃক্ষতলে কে দাঁড়িয়ে? দীর্ঘচ্ছায়া ব্যক্তি তখন হাতে তুলে নিয়েছে তার পরমপ্রিয় বাঁশিটি। ক্রমে নদীতট ভরে ওঠে ভৈরবীর মূর্চ্ছনায়। সেই সুর যমুনাতীর ছাড়িয়ে...ছড়িয়ে যায় ব্রজধামের অলি গলিতে। রূপসী কোমল রেখার আর উদাসিনী ধৈবতের শরীরে তখন চিকন কালার আঙুলের পেলব স্পর্শ ছুঁয়ে যাচ্ছে পরম যতনে। যমুনাপুলিনের অনতিদূরে ব্রজের গোপপল্লীতে তখন চলছে দিনারম্ভের তোড়জোড়। এমন সময় ভৈরবীর মূর্চ্ছনা প্রবিষ্ট হয় কন্যাটির কর্ণকুহরে। নবযুবতী তুঙ্গবিদ্যা ধড়মড় করে উঠে বসে শয্যায়। আহ্! ভোর হয়ে গেছে। সুশীতল বাতাস বইছে মনোরম ছন্দে। কিন্তু সেই বাঁশি বুঝি তাকেই ডেকে চলেছে অনবরত। যমুনাপুলিন তাকে ডাকছে।

তুঙ্গবিদ্যা এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসে। তার বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখে এখনও বিজড়িত ঈষৎ তন্দ্রা। তার গাত্রবর্ণ অনেকটা সূর্যাস্তের লালিমা সদৃশ। পরিধানে শ্বেত অধোবাস ও উত্তরীয়। পৃষ্ঠজুড়ে আলুথালু কৃষ্ণ কেশ। দৃষ্টি উদাস। বিভঙ্গ জড়তাবিহীন।

'কোথায় চলেছ কন্যা, কোথায় চললে এই কাজের সময়ে?' পেছনে মাতা জিজ্ঞাসা করছেন তাকে। এ অতি সত্য। ভোর না হতে হতেই গোপপল্লীর প্রতিটি বাড়িতে দুগ্ধ দোহনের পালা চলে। তারপর তাজা দুধ থেকে প্রস্তুত হয় মাখন, ঘৃত, দধি। সেই পসরা আবার মেয়ে বৌদের মারফত পৌঁছে যায় মথুরার বাজারে।

'মাতা একটু চন্দ্রাবলীর কাছে যাব গো...এই যাব আর আসব।' কন্যাটি বলে ওঠে।

তুঙ্গবিদ্যার মাতা ঈষৎ ভ্রু কুঞ্চিত করেন।' আয়ান ঘোষের বাড়ির পানে যাচ্ছ না তো বৎস?

'না গো মা, এই সাতসকালে জটিলা খুড়ির হাঁড়িমুখ দর্শনের কোনো অভিপ্সা আমার নেই।' কন্যাটি মাকে আশ্বস্ত করবার প্রচেষ্টা করে।

তুঙ্গবিদ্যার মাতা মেধার শঙ্কা তবুও কাটে না। আয়ান ঘোষের পরমা রূপসী নবযুবতী বধূটির চরিত্র দোষ আছে। ঘটনাচক্রে তুঙ্গবিদ্যার প্রিয় সখী ওই বধূটি। কোন মা বা চায় তার মেয়ে কোনো কলঙ্কিনীর সাথে মিতালি পাতাক।

'উফ্, মা কাত্যায়নীর কৃপায় এই শ্রাবণেই বাছার বিবাহটি হলে বাঁচি।' তিনি স্বগতোক্তি করে ওঠেন।

মাধবীলতা মঞ্জরিত কুটিরদ্বার অভিমুখে যেতে যেতে তুঙ্গবিদ্যার কানেও পৌঁছে যায় উক্তিটি। খুব জোরে হাসি পেয়ে যায় তার। ব্রজের প্রতিটি অনূঢ়া কন্যা হেমন্তে মা কাত্যায়নীর ব্রত করে নিয়মমতো। পুজোর পাঁচ দিন আগে থেকেই শরীর ও মনের শুদ্ধি হেতু গ্রহণ করতে হয় হবিষ্যান্ন। তবেই মায়ের কৃপায় মেলে সুযোগ্য স্বামী। গত বছর কার্তিক মাসে মা কাত্যায়নীর ব্রত সে বড়ো মন দিয়ে করেছিল। কিন্তু তুঙ্গবিদ্যা স্থির নিশ্চিত...ব্রজের প্রতিটি অবিবাহিতা কন্যাই সেবার স্বামী হিসেবে চেয়েছে ওই নন্দনতনয় কানুকে। মা কাত্যায়নীর বড় সংকট। তিনি কার ঝুলিতে ফেলবেন ওই শ্যামময়কে। এদিকে অপসৃয়মান সুশ্রী কন্যাটির দিকে

দৃষ্টিপাত করেন মাতা মেধা। বিদূষী এই কন্যার জন্যে সুযোগ্য পাত্র মেলেনি এখনও। বেদজ্ঞান, সঙ্গীতবিদ্যা এবং চিত্রকলা সবই অতি সাগ্রহে করায়ত্ত করেছে এই স্বভাবজ মেধাবী কন্যাটি। তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

যমুনাপুলিন তখন নব সূর্যের লালিমায় উদ্ভাসিত। পত্রপুটে, বৃক্ষরাজিতে, পক্ষীদলে নবীন দিন শুরুর চঞ্চলতা। একটি ঘনপক্ষ্ম কদম্ববৃক্ষতলে বংশী বাদনরত কানু। সুঠাম তার দীর্ঘ অবয়ব। গাত্রবর্ণ অস্ফুট আলোকের মতো উজ্জ্বল শ্যাম। মাদকতাময় চক্ষু দুটিতে তাবতন সংসারের সমস্ত প্রেমরস জারিত। তুঙ্গবিদ্যা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সেই মর্মর মূর্তির সামনে। এমন সময় বাঁশি নামিয়ে তুঙ্গবিদ্যার দিকে তাকিয়ে কানু হেসে ওঠে ছলোছলো। তুঙ্গবিদ্যার শরীর তখন আড়ষ্ট।

অতি কষ্টে সে বলে ওঠে, 'ডাকছিলে কেন কানু?'

কানু তার আড়বাঁশিটি কোমরে গুঁজে নিয়ে বললে, 'তিন রাত...তিন দিন... শ্রীরাধা গৃহবন্দী। বিদ্যা, তাকে না দেখে থাকি কি করে বলো? কিছু উপায় যদি না করো সখি...কানু যে মরে যায় বিরহে।'

এ আর এমন কি, যদি প্রাণটি চায় কানু তাও তো অদেয় নয়।

'নিশ্চয় কানু...আমি তো আছি, চন্দ্রাবলী আছে, ললিতা, বিশাখা সকলে আছে...তোমার জন্যে আমরা এটুকু পারবো না?' তুঙ্গবিদ্যা একটু হেসে বলে ওঠে।

তারচেষ্টিত হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে খানিকটা ঈর্ষাও। বুদ্ধিমন্ত কানু কি তা দেখে না কখনো।

আয়ান ঘোষ অতি সম্পন্ন গৃহস্থ। গৃহখানি তার পুষ্পপল্লব মণ্ডিত আল্পনা রঞ্জিত অতি সুসজ্জিত। কিন্তু শোনা যায় গৃহের গৃহিণী খানিক মনমরা...গৃহকাজে তার মন নেই। এ যেন অতি বড়ো সুন্দর ঘর না পায় ঘরণী। বিস্তৃত আঙিনায় আয়ান ঘোষের মা জটিলা দাস দাসীদের নির্দেশ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। তখনই চার অবগুণ্ঠনবতী যুবতী উঠোন প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

তার মধ্যেই একজন বলে ওঠে...'মা গো সুদূর হস্তীনাপুর থেকে আসছি গো মা...দেখ বস্ত্র সম্ভার নে...গেহের সুন্দরীদের ডাক গে...এমন সুযোগ হেলায় হারিও নে।'

জটিলা অবিশ্বাসী দৃষ্টি হানেন। তারপর বলেন, 'বৎসা সকল, অবগুণ্ঠন কেন তোমাদের?'

এমন সময় হঠাৎ আয়ান ঘোষের বধূটি গৃহ থেকে নির্গত হল। যেন মেঘের আড়াল থেকে দৃশ্যমান এক বিদ্যুল্লেখা হীরক দ্যুতিময় তার অঙ্গবর্ণ। অসামান্য তার মুখশোভা। কিন্তু তার আয়ত অক্ষিদ্বয়ে সমস্ত চরাচরের বিষণ্ণতা যেন প্রোথিত। আজানুলম্বিত তার কেশদাম অবহেলায় ছড়ানো। ঘোমটার আড়ালে তুঙ্গবিদ্যা খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে পড়ে ওই তুমুল রূপের সামনে। উফ্, সে যদি অমনি রূপসী হতো!!!

ঘোমটার আড়ালে ওই চার যুবতী আসলে কানু আর রাধার চার সখী...চন্দ্রাবল, চম্পকলতা, বিশাখা ও তুঙ্গবিদ্যা। তাদের সংগ্রহে যত বস্ত্র ছিল... সব নিয়ে তারা আগত রাধার শ্বশুর গৃহে। আজ রাতে রাধাকে নিয়ে যেতেই হবে যমুনাতটে...কানু সন্নিধানে।

'অবগুণ্ঠন কি আর সাধে দিই মা...পথে পথে ঘুরি...তাই সোয়ামিরা মাথার দিব্যি দিলে...ঘোমটা কখনো খুলবে না। মা গো, তোমার এ বধূটি যে সুন্দরী...তার নখাগ্রও তো নই আমরা। একেও অবগুণ্ঠন দিয়ে রাখো মা। অবগুণ্ঠন থাকলে দেখবে আর কোনোদিকে মন যাবে না বধূর...সংসারে মন বসবে। এই দেখো...আমাদের কাছে গান্ধার দেশীয়, মদ্রদেশীয়, প্রাগজ্যোতিষীয় উত্তরীয় আছে।'

অন্তরালবর্তী তুঙ্গবিদ্যার যুক্তিগুলি বেশ পছন্দ হলো জটিলার। তিনি আদ্র হয়ে বস্ত্র পরিদর্শনে সম্মতি দিলেন। আর, কে না জানে রমণী মন পরিধেয় বস্তুর প্রতি ইনত আসক্ত।

চন্দ্রাবলী তার অতিপ্রিয় একটি নীলামাত্মবরী উর্ণা ুত্তরীয় রাধার স্কন্ধে স্থাপন করে। এই বহুমূল্য ঊর্ধ্ববাসটি তার স্বামী গোবর্ধন মল্ল মথুরা থেকে এনেছিলেন প্রিয়া পত্নীর জন্যে।

'দেখো মা,...তোমার বধূকে কেমন দেখাচ্ছে!'

স্থির বিজুরি রাধার দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন জটিলা। তারপর একটু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে নীলাম্বরীর জন্য সম্মত হন। বিশাখা তখনই ক্ষিপ্র হাতে ওই নীলাম্বরীর মাঝে গুঁজে দেয় সখী চিত্রার তৈরি একটি বিশেষ জড়িবুটির নির্যাস কড়া মাদক এবং একটি তাম্বুলপত্র। তাতে লেখা আছে কানুর বিরহ বারতা এবং ওই মাদকরসের প্রয়োগবিধি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই চলে গেলে বিষণ্ণ বধূটি হঠাৎ খুশিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শাশুড়ি ভাবেন...নীলাম্বরীতে মজেছে বুঝি বা পুত্রবধূ তার। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। যাক, সংসারের কিছু তো ভালো লেগেছে তার বধূর।

যমুনাতটে তখন জ্যোৎস্না স্বচ্ছ নীলাভ আঁধার। বেহাগের সুরে ভেসে যাচ্ছে চরাচর। কানুর প্রেমময় স্বরবিন্যাস অনায়াসে ঘুরে ফেরে শুদ্ধ মধ্যম থেকে তীব্র মধ্যমে। বাঁশির সুরে নিমগ্ন কানুর পতদলে বসে আছে বিরহিনী রাধা। তরুলতা, বৃক্ষরাজীর ফাঁক দিয়ে সেই অপার্থিব দৃশ্যের সাক্ষী হয় আর এক নবীন যুবতী...তুঙ্গবিদ্যা। তবু কেন তার বুকের ভেতর জমে থাকে বিষাদের এক অদৃশ্য প্রস্তর!!! শরীরে, আত্মায় সে অনুভব করে এক সুতীব্র দহন। সে ছটে যায় যমুনাতটের আর এক প্রান্তে। তার দুই চোখে তখন প্লাবন। যমুনার জলে পা ডুবিয়ে সে কেঁদে চলে অবিরাম। এমন সময় তার কাঁধে কে যেন হাত রাখে। চমকে ফিরে সে দেখে...কানু!

'কিন্তু রাধা...সে কি একাকী?'...

... কানু তখন তার মধ্যমা ছুঁইয়েছে তুঙ্গবিদ্যার ওষ্ঠে। কিছু পরে যমুনার তীরে পা ডুবিয়েও দুটি নরনারী বসে থাকে পাশাপাশি। একের কাঁধে অপরের মাথা। খণ্ড...বিখণ্ড, চূর্ণ...বিচূর্ণ সময়েরা পল অনুপল হয়ে যায় ধীরে। বিন্দুবত। পরিশেষে সময়ের ক্ষুদ্রতম আধার। মুহূর্তস্য মুহূর্তম্। একসময় স্তব্ধ হয়ে যায় প্রবাহ। তখনও মাথার উপর শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্রদেব মুচকি হাসছেন। তিনি সাক্ষী থাকেন সব বেদনার কিংবা তার অবসানের। কানু তো আছে সবখানে...ওই কদম্বতলে...ওই নদীতটে কিংবা সব বিষাদিত নারীর অন্তরে। কারো সিক্ত উপাধান প্রান্তে...কারো লজ্জা বস্ত্র হয়ে...কারো প্রেমভিক্ষায়। তাকে যে...যেভাবে দেখে...ঈশ্বর...সখা...প্রেমিক।

Oyster-Life

Sudipta Biswas

Now, in this beautiful world
We'll live an oyster-life.

I'll hover throughout the night
Keeping my palm on your palm
Giving up all calculations
With leaf and with stars
We'll live an oyster-life.

Pearl like white foam will condense.
Bright day will come out from the mist
Suddenly, getting a single penny or two
Poor children will present us a bright smile.
Now, we'll live a bright oyster-life.

In the clear sky of the mountain
Very bright stars will come out.
Not with flowers,
But by collecting leaves from the ground
We'll pray to the jungle goddess.
We'll live a sacred oyster-life.

A red rose is blooming in the garden
Other trees, clapping their leaves,
Congratulating her...Now, please come,
We'll live a rosy oyster-life.

If anybody recognizes us,
I'll present him a flower from my poetry books.
Oh! Look at the sun-yolk in the eastern sky.
With the sacred Gayatri-mantra
Now, let us live a holy oyster-life.

This winter, not with any poppy leaf or rose

I'll hibernate with you, only with you, butterfly.
Now, let us live a drowsy oyster-life.

Two lives will unite into one
In the tranquil moonlit night
We'll fly in the sky, where
the moon and cloud will fight.

Let a bird build her nest
Let a bee build a hive
Let us dissolve all disputes
Let us live an oyster-life...

Starry Sky

Mrs. Manika Datta (M.A.)

Starry sky above, so high;
Looks captivatingly winsome;
We espy 'on them from the globe
And wax mirthful.
Come! Come! Oh the stars!
Come down nigh the Earth,
We want to abut you with our hands
And we discern thy mien from our birth.
You manifest yourselves in the heavens!
During the nighttime, in radiance, abound!
We are enthralled gleaning thy beauty;
Up, up, way so high!
Our elation knows no manacles to bind,
When we glimpse the stars.
Wondrous and frolicking, my heart races -
As stars fill up a bromidic verse.

Nightmares
Arunima Chowdhury

The Morning is good...

How scary was the night might be...

Still I long for the dark...

Still I moan for the scary...

I relish the depth of the fever,

I enjoy the thundering death...

I wish, I could die for manytimes a night,

I wish could be insane...

Midas
Niloy

I have seen king Midas the other day,
A black skeleton with chronic asthma.
Waddling were his feet and arms
And they shivered and fumbled,
As his eyes crumbled for those
Waters at ghat.
Silent leaves were there,
Being afraid witness ... as the
punished man, touched...
I struck in awe...you can see,
the pieces of water made into sprinkle of gold...in the wrath
Of midsummer sun.

Yesteryears
Anindita Bose

The smoke flies in circles
with unheard voices while
the heart beats to travel in
lost tales

A staircase of dreams
meandering in spiral
thoughts around the butt
ends of cigarettes

In midst of such wisdom
a tiny voice flutters from
within

Will a day come with golden
rays of sun entering the life
to never leave again

The shadows of yesteryears
vanish in a flash and
remains behind an essence

of another you

She And Her Home

Sharmistha Ghosh

She was struggling hard to step forward gasping her walking stick . A shadow of pain passed evidently over her fair face with every trial. The middle aged ayah (the helping hand of the patients) stood beside her giving supportive gestures. She could hear the noise made by her children coming from the drawing room. They were fighting with the TV remote to shuffle their favourite channels. Their paternal grandpa was reading something sitting on the sofa and expressing occasional disgust over their manner . The children were of six and four respectively. A boy and a girl . For many a months they did not hug their mother. They even do not bother to tell her about their needs . They do not come to her room to play or read sitting beside her . They are avoiding their mother as if she does not matter in their lives anymore . She sighed looking towards the drawing room. A bright light was illuminating it. Her room looked dim with a low powered CFL . Her mother in law was giving instructions to the cook. These days she is in charge of the household and never feels like asking what to cook even for the babies . She does not know anything about the home tasks of her children . She is not aware of their new toys or dresses. She does not know whether they attend their classes regularly or not . The last PTA she attended is over six months ago . They do not care to talk to her about anything . As if she is nobody . As if she has died the very day she had her cerebral attack . She lost her memory for some days . Now she can remember things . She was having shower that day . She was in a hurry . She was to fetch her daughter from the bus stop where she would be dropped by her school bus at about 1 pm . She had to reach there at least ten minutes earlier . The girl would get down from the bus smiling at her, hugging her and climbing up her lap and telling all about she had experienced in her school all along the lane to home . two siblings are at the same school. The elder would come back at 4. They read at a renowned English medium school of the city. Their dad works in the IT sector . She does not work outside by her own choice . Their dad too feels relaxed to think about the wellbeing of his children . The mother is there to take care of them . They were classmates. They know each other from their teens. She has no regrets. She is a good mom to her children and knows tit bits of her children and household . Her mother called her over mobile few minutes ago. She could not talk to her for long as she was busy doing household cores . Her mother was anxious about her health . She promised to call her back after bringing her daughter from school. She stretched her right hand to have the leather soap . She could not open her eyes properly as the water was tickling down her eye lids . Suddenly she felt like black out and fell down on the floor . Her neighbors were alarmed by the maid at 3. The mobile was ringing continually from 1:30. The school bus has returned the girl to her school. The Principal called her father . He called his wife back home in vain . He

called his neighbors too. So there were a number of people in front of her flat calling her by name . They were getting anxious gradually and decided to break open the door . They all love Bandita. She is such a gracious lady and so jubilant and modest natured at the same time. She is very caring and helpful to everybody around her . The ladies enjoy chats or movies or pujas or games or parties in their community hall for this occasion or that . Everywhere Bandita plays the pivotal role . She is a good manager, planner and action taker . She has a solution for everything in her sleeves . She can manage everything with a smiling face and fun and laughter . She has no complaint against anybody ever . At last her neighbors discovered her at the wash room lying amid blood and water flowing simultaneously . She was unconscious . They informed her husband. They rushed her to a hospital nearby but they declined to admit such a critical case . They showed an excuse of improper infrastructure . At last they got her admitted to a private hospital on the bypass seeking intervention of one of her neighbors who was a doctor himself. They gave no assurance of her life . A bond was given . They waited cross fingered . She was rushed to the OT. They operated on her on the emergency basis to drain out the clotted blood from her brain. She was in coma. After seven days a medical board was set up which operated on her for the second time with assistance of the renowned neurosurgeon of the city . She remained in the CCU for one month . Her husband decided to sell the flat if needed to meet up the expenses. He drew every paise possible from every possible sources . And a miracle happened at last. She opened her eyes partially again. But it was a blank vision . She could not recognise anybody. Her left side was paralyzed . Physiotherapy was started . Her parents rushed to her place. The children stuck to their paternal grand parents . A new fighting was on. She got back home after three months . From then on she was confined in the guest room of her house . A ayah was appointed for her . Her husband sleeps in their bed room with the two children .

It is now six months from that day . She is recovering slowly . The doctors thanked god and her will power . As she fears to fall again she can’t walk on her own . Another attack means another beginning from nothing . She is becoming shaky. She is feeling unwanted . She hankers after her children’s tender touch on her cheek . She feels like crying every time she understands that everything has changed . She is losing confidence as well . She is feeling lost without love, care, empathy . There is only compassion . There is only indifference . All day long she spends inside four walls. Her husband comes at the door step and gives instructions to the ayah to give her food and medicine timely . He never sits beside her or tells anything to encourage . All the time at home he spends by watching TV or talking with his parents and children . She regrets her luck, she does not want to live anymore. She is only a habit, a burden to them . Her

parents call her twice a day . They cry . They only care. They are living for her . They cant come and stay with her for long . They even can’t take her away with them from her house . Her house is no more her house . She is an alien there . She dreams about her childhood days, running at the sea shore with her father, mother calling from the back, trekking up the Hilly region of North during the vacations . She stares at the photograph hanging on the wall of her solitary cell. There is a girl sitting between her parents , smiling heartily. A small family is a happy family . She murmurs , ‘Come on mom, hug me like this , keep me at your breast, hold me tight, am falling!’

Job Hunting

Biswajit Ganguly

I. A Brief Introduction

Bengali people have many ways to show their high social statuses. Here I shall give you one example in this regard. Suppose an old man's son has completed his Engineering degree in Computer Science and then looking for a job in Bangalore. The proud father will thus say, "My son is in Bangalore". The listeners will interpret the inner meaning as the son is earning money in crores of rupees per annum and he might be temporarily living at some Bangalore Palace! And very soon his company will send him to an esteemed client's place (say, Google or Apple's headquarter in USA).

Now, I am a B.Tech. graduate of 2014 and came to Bangalore for job hunting. My father had circulated the news of my living in Bangalore. And after receiving the positive reactions from relatives, locality people and his office colleagues, his chest size increased by 5 inches in sheer pride! Well, I am just kidding.

But those of you, who may be still thinking that Bangalore is the city of dreams, this story is for them. If you know about me, your perception about Bangalore is going to change!

II. First Few Days in Bangalore

My first day in Bangalore was spent in finding a male paying guest. I found Anna PG near the main road of Rupena Agrahara. All the rooms were on four-people sharing basis. There I liked a room on the first floor. The room number was 13. Room owner took ? 5000/- as advanced rent and ? 2000/- as caution money before handing over the key. The first thing I did after coming to my room was not placing the luggage properly or untied stuffs. My first activity was sleeping. I was tired of the train journey.

I woke up before the dinner. Actually, it was one of my roommates who forced me to wake up. Otherwise, he thought that I would wake up at 3 am and cry for food. I asked his name. His name was Lalkrishna Anand. I chose to call him by his surname as his first name was a bit difficult to pronounce. Other two roommates were Pankaj and Sandeep.

Pankaj informed me that Anand was the senior most guy in our group. He said, "Anand has maximum experience among us. Five years!"

I reacted, "Wow! For five years he has been working in Bangalore? In which company?"

Pankaj corrected me saying, "Count five years not as job experience but as job searching experience. He is still jobless. I have only one year experience in searching for jobs."

I was surprised. I asked, "Why you guys are struggling to get a job? Bangalore has lots of companies!"

Hearing my remark about unemployment, Sandeep had a smile on his face. He said, "Stay with us for few months and you will know."

III. Experience on Job Hunting

First thing I did for job hunt was to visit some reputed job consultants in Bangalore. When I got a call from a job consultant, I was feeling like I was just few steps away from my first job. The girl was repetitively calling me on every hour on the date of interview. I was sleeping and she was calling. I was bathing and my phone rang. I was arguing with the Kannada bus conductor as he did not have the change of two rupees and the girl called me to ask if I was really going for the interview or not. I assured her by saying I was already on my way. I felt very happy thinking that I might be the Star Candidate for the job. The company might be interested to recruit only me. So, the recruiting girl is calling me again and again. Finally, when I reached the interview spot, a different situation was awaiting for me. I saw that five hundred people had come for the interview! They called such interview as "recruitment drive". I went to face interview at 10 a.m. and then my waiting started. It seemed to me at one time that I have been waiting for last one million years! Anyway, at around four, someone called by my name and I was brought to a room for giving a multiple-choice technical examination. I completed the exam in forty-five minutes and after that I was asked to leave. The HR people said, they would call me in next two days if I would be shortlisted for the next round.

For the first time I was feeling very excited. I was thinking when they would call me in next forty-eight hours and say "Mr. Arnab, how soon can you join? And we have decided to give you an initial package of 12 lakhs per annum. Is that okay with you?"

Unfortunately, my day dreaming resulted into nothing. The HR managers from my first interview did not call me not only in next 48 hours, but also never after that. Later I got to know that no IT company cared much about fresh engineering job seekers. For one developer job, more than one thousand CVs were sent and five hundred candidates would come for the interview. If I knew this before, I would have never come to Bangalore.

IV. Life at a Male Paying Guest House

In Bangalore hostels and PGs, mainly unemployed Techies live. They try to spend more time on their laptop than meeting up with their girlfriends. Because, they knew if jobs won't be there, pocket money won't come. And if pocket money won't come, then their girlfriends would become girlfriends of other boys! Hence, they spent most of their times reading about coding theories and doing Java or .Net programming on laptops.

Only few boys in every hostel were job doers. Other boys used to talk about their good luck and they envied them. Those job doers got the attention like a national youth icon. Whatever they will do, the other boys in the PG would start copying that. If a job doer bought a new Java book, others would secretly get the details of that book and then they would order the same book online. If a job doer kept a bald head, had two girlfriends, ate chicken on weekends, watched one romantic film in a month, the other boys would start immediately imitating those activities. They would think that copying a job doer 's lifestyle would made them feel him. They would also get a job like him. In Bangalore, boys worshipped lord Ganesha for ten days during Ganesha festival. For the rest of the year, they worshipped their office going seniors.

Unemloyed hostel boys did not wake up before 11 am (except on interview dates). The boys will go for a walk in groups. They would spend most of their time at tea shops where they would drink tea four times a day. After drinking tea, they would openly argue about who paid it last time and it was whose turn to pay then.

In my hostel, five guys had internet connections and rest of the boys accessed their connections through Wi-Fi. That saved the cost of individuals. That also brought down the net speed to almost zero (meaning an YouTube video of ten minutes will pause for hundred times).

Hostel boys loved walking to Madiwala (the name of place) during afternoon. The purpose was not to do bird-watching at Madiwala lake. During afternoon time, girls used to come in groups near the lake. And boys went to watch them. According to an unidentified local doctor, "Watching girls is good for every boy. Such activity adds Vitamin-G (G stands for Girls) to a boy's eyes and makes his eyesight strong." So, I suppose, for a healthy cause, the boys hung around near Madiwala lake. Even I joined the group to keep my eyesight strong!

The biggest enemy of boys was not the PG owner, who used to harshly ask for the rent on time! Our biggest enemy was a swarm of insects called bed-bugs. Bed-bugs were very naughty. They would bite us all night long and put the blame on mosquitoes. If a new guy came to our hostel, he would be surprised to see the blood stains on the

walls of every room (like a horror movie!). Well, those blood marks are the remains of many fierce battles between humans and giant bed bugs. Naturally, we humans became victorious in every battle by catching & crushing bed bugs in walls. And beg bugs continued to become martyrs after sucking our blood in dark. As far as I know, no police officer or Sherlock Holmes came from Madiwala police station to investigate & punish the "criminals" of this mass insecticide. I am sure that they also battle with beg bugs at their homes!

Hope the above stories give you fair idea about life at a male PG.

V. Meeting with Anjali

Many students and job seekers come to Bangalore to try their luck. Anjali was such a girl. She was a B.A. Honours graduate. She came to Bangalore after getting an offer for a call center job. After a week-long working in night shift, Anjali got cough and cold. Also she had high fever. And all the time in work place, she felt sleepy. Those problems cost her to lose the job.

Anyway, Anjali soon got an IT recruiter's job to hire engineering graduates as developers. And one day she called me with a job offer. She did not have any idea about whether I am the right fit for the job or not. So, I had to make her understand about my present skills and required skills for the job. We spoke about fifteen minutes. She asked me about my qualification, project, location and salary expectation. When I said I was new in Bangalore, Anjali also said that she had also been there for four months. Anjali had a tendency of frequent sneezing. She was talking to me like, "Are you interested about this job offer? Achoo, excuse me," and "What is your expected... a.. a... achoo, excuse me... CTC?"

I answered all her queries and also suggested her to consult a doctor. She thanked me for my suggestion. Anyway, our conversation ended but I saved her number.

After that I started calling her on every week and asked her about new job openings. One day, I went to her Consultancy and we had a long unofficial chat. Both of us shared our own experiences in Bangalore and we also saw that we have so many things in common (like Anjali, I also sometimes sneeze a lot when I have cough and cold). We loved the lazy lifestyle like a cartoon cat called Garfield, we loved eating Phuchka or Panipuri (actually she loves it a bit more than me). And we both hated Bangalore's traffic jams and irritating bus conductors. And she also hated bed-bugs like hell (she lived in a Girls PG).

Anyway, as Anjali was planning to take her lunch break, she and I went to the nearest

ice-cream parlour. There we relished ice-cream scoops with the thought that ice-cream may fully cure our sneezing tendency!

While it comes to eating out with a woman, we men show our manly attitude by paying the bills. But I was different. I believed in women empowerment. So, I kept my male ego away and allowed Anjali to pay the bill. Bad people would say, I shied away because I was jobless and out of money. Curse them!

VI. Beginning of a New Story

My father was really upset about me. He wanted to tell everybody that I got a chance in a big MNC. Instead he heard that I somehow managed to get a Java developer's job in a startup company. My father specially became angry when he heard the company name, Telebhaja Technologies Ltd.! Telebhaja specialises in making all crispy food related websites, Android & iOS apps for its clients in USA, UK and India. Unlike my father, I became very happy. Anjali's professional contacts helped me to get that job. So, I anaged to bag my first job in Bangalore. Also, I got my good friendship with Anjali going strong in Bangalore. Anjali was a very sweet girl. She understood me very well and unlike other girls, she was not very demanding. We were still eating ice-creams and Anjali was used to pay the bills, as I was yet to receive my first salary. Anjali's cough and cold problem was vanishing quickly. I no longer had to hear "achoo" from her. Her cough & cold virus (or viruses) was replaced by another long-term sustaining virus. A virus called love!

একশো বাহান্ন

অরুণিমা চৌধুরী

একশো বাহান্ন অপরাধের পর

হাত, পা, মুণ্ডু এমন কি ছাল বাকলও ছাড়িয়ে নিয়ে ঝোলানো হুক থেকে টুপিয়ে টুপিয়ে পড়ছে রক্ত, ক্ষমাহীন, এতোটুকু স্নেহস্পর্শ কোথাও নেই।

অনন্ত তৃষ্ণার বুকে একশো বাহান্ন কোপে

শবের বলি দিয়ে, মৃত পাতকুয়ো থেকে

মাত্র দুছিপি জল তুলতে পারিনি, তাই

আমারই দেহের পাশে বসে থাকে।

সম্পর্কের লাশ

একশো বাহান্নটা হাত উৎসর্গ করার পর

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছ। বেয়াড়া কপাট, কড়ার দাগ বড়ো স্পষ্ট এখানে।

একশো বাহান্নবার বলার পর ভালোবাসা

বাসি ও ম্লান, অবিশ্বাসী অক্ষরের ছড়ানো ছিটানো ভীড়ে হারিয়েছে শ্যাওলা মাখা মুখ।

একশো বাহান্নবার মৃতুর পরে শব্দেরা অর্থহীন বোবা, বন্ধ দরজার পাশে রুগ্ন কুকুরের মতো শুয়ে থাকে।

একটা শেষ না হওয়া গল্প

মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী

যেতে যেতে হঠাৎ-ই
মাঝ রাস্তায় তার সাথে দেখা।
পুরোনো অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।
ইতস্তত ভাষাহীন অভিব্যক্তিগুলো
হাতড়ে যাচ্ছিল উপযুক্ত শব্দের প্রত্যাশায়।
প্রথমে সেই মৃদু হেসে জানান দিলো
এগিয়ে আসার ইঙ্গিত।
ঠোঁটের কোণায় অনিচ্ছার হাসি
হাল্কা দাগ কেটে গেলো।
জিজ্ঞেস করলাম—
'কেমন আছিস?'
ওর অপ্রস্তুত মুখটাকে ঢেকে দিলো
আরো একটি প্রতিহাসি।
বলল—"ওই যেমন দেখছিস।"
দেখলাম বকবক করা পাগলী মেয়েটা,
বেশ সংসারী হয়ে উঠেছে।
বললাম—ছেলে কোন ক্লাসে?
উত্তর এলো সবে ক্লাস ওয়ান।
ওকে এতো গোছানো সত্যিই আগে দেখিনি
ওর শরীরের প্রতিটা উত্তেজনা শিহরণ,
ঘেমে যাওয়া ভিজে পিঠ কিংবা এলো চুল,
আমার চেনা; তবুও

আজ ওকে কেমন জানি অচেনা লাগছে।
হঠাৎ ভুল ভাঙলো।
যা কিছু আমার ভেবেছি—
তার অধিকার তো আমার আর নেই।
যদিও, ওর আমার দিকে তাকানোর ধরনটা
আমার খুব চেনা।
বললাম—'একটা কথা বলি?'
ও সায় দিল।
'যা কিছু শেষ হয়ে গেছিলো,
সত্যিই কি নতুন করে শুরু করতে পারতাম না আমরা?
প্রেমটা কি এতই ঠুনকো ছিলো আমাদের?'
সে বলল—"প্রেম? আদৌ কি ছিলো?
ওই ভাঙা সম্পর্কটাকে তুই প্রেম বলিস?"
আমি হাসলাম!
অবাক হলো ও— 'তুই হাসছিস?'
সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।
এগোতে হবে এবার।
যেতে যেতে বলে গেলাম—
"কে বলেছে তোর আমার অসম্পূর্ণ গল্পটা
প্রেম না?"

ক্ষত

বিকাশকুমার সরকার

ডুবে মরার জন্য একদম অগভীর তুমি
আমাকে দিয়ে তোমার গভীরতা মাপছ
পরীক্ষার প্রার্থনীয় টেবিলে ব্যবচ্ছেদ ব্যাঙের মতো
ভুলে যাচ্ছ শরীর আসলে সাড়ে তিন হাত মাটি

আমি কিন্তু তারপরও মন মাপার একক
রক্তে গুলে সবার কাঠামো রঙ করছি
এখন আর বের কোরো না বাইরে ভেতরের জলকাদা
ভণিতা করে যখন কেড়েই নিয়েছ তোমাকে দেখার অধিকার
ছিনিয়ে নিতে না পারার আক্ষেপ আমার কিছুটা থাক
যেখান থেকে শুরু হতে পারে নতুন শিল্প—

আপাতত আমার হাতে তুলে দিয়েছ কলম
সারাজীবন করব এবার শব্দবমি

ঘুমাও রাজকুমার

মণিকা দত্ত

ঘুমাও রাজকুমার, ঘুমাও, নিদ্রাসুখ তবে তরে আছে,
নিশ্ছিদ্র ও নির্বিঘ্ন যেন তব সুখ হয়, সে কথা সবাই ভাবিছে।
তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত যেন করে না কো কেহ,
আনন্দপূর্ণ রহিছে সবাই, আনন্দপূর্ণ তবে গেহ।
ঘুমপরী এসে ঘুম পাড়িয়ে যায় তোমায়,
জয়ধ্বনি চলে প্রতি ঘরে ঘরে : হায়।
মঙ্গলশঙ্খ বাজায় কাহারা, আনন্দপূর্ণ যত সাধকেরা,
আনন্দ আনন্দ শুধুই আনন্দ, আনন্দে রহিছে সবে মাতোয়ারা।
দীর্ঘকাল ধরি নিদ্রাসুখ ভোগ করিবে তুমি,
নিদ্রাশেষে অবশেষে জাগিবে কাহার চরণ চুমি।
অনন্ত কাজ পড়িয়া আছে তবে তরে জগৎ মাঝে,
আমরাও করিব কাজ তবে সাথে সকাল সাঁঝে।

কে জানে

মোঃ জাওয়াদুর রহমান

আমি জানি এ জলযোগে চাহিদা তৈরি হয় না
আমি ইতিহাস নিয়ে অনেক ঘেঁটেছি
অনেক দর্শন শুষেছি শহরের এপার থেকে ওপারে
যাদের জ্ঞানের ক্ষিদে ছিলো ঠিকই মারা পড়েছে অনাহারে
ধর্ম নিয়ে অনেক বিবেক খেচা শব্দ তৈরি ছিলো
সেই শব্দ গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আবর্জনা বানিয়ে দিলো
আবর্জনায় ভিজলো এই মাটি
যেখানে অসাম্প্রদায়িক নামে রাষ্ট্র ছিলো

অনেক অভিযোগ পেট থেকে বেরিয়ে বের করে দিলো চাকু টেনে
গলা দিয়ে শব্দ বেরুলেও রক্তের ফিনকি দেখলো মা
কে জানে কোন দোষে মা ছেলেকে হারায়
কে জানে কোন দোষে তারা ধর্মগ্রন্থ পোড়ায়

আমি ধর্ম জানি না
কর্ম মানি না
ঈশ্বর মানে নাকি সবাই তাও বুঝি না
মানুষ তো সব কখনোই জানে না
তবে কোন স্বর্গ কোন নরকে যাওয়ার পথ জানে মানুষ?

অসম প্রেম

তপন এম চিশতী

একরাশি
নদীর জল, একাত্মভাবে
চেয়ে আছে নিঃসঙ্গ চাঁদটার দিকে।
বলতে চাইছে,
সহস্র বছর ধরে জমে থাকা
না বলা তার অপেক্ষার কথা।

সে অবিভূত, চাঁদের
অকৃত্রিম অপরূপ সৌন্দর্যে।

চাঁদ জানে,
তাকে ছাড়া এই সৌন্দর্য
একেবারে অসম্পূর্ণ। তাইতো
সে একাত্মভাবে মিশে যায়,
নদীর জলে...।
সেও চায়
তার এই নিসঙ্গতা-একাকিত্ততা,
চিরদিনের মতো দূরে সরিয়ে দিতে,
জানাতে চায়
সুখ-দুঃখ মিশ্রিত
একান্ত ভালোবাসার কথা।

কিন্তু...
এ ভালোবাসা যে অসম...।

যে শব্দে নির্জনতা বাড়ে

জয়দীপ চক্রবর্তী

মনের মধ্যেই অদ্ভুত মায়া নিংড়ানো আর—একটি মন রান্না-বাটি খেলা করে;
উষ্ণতা সঞ্চিত কবেকার সম্পর্ক...
নির্জন হেমন্তের হিমেল বাতাস, চাদরের পরশে স্বেদবিন্দুস্নাত অভিমানী বেহাগ জমায়...

সম্পর্ক মানে ক্ষয়ের বিহ্বল প্রস্তাব :
একান্নবর্তী সংকল্প একক সহ্যের লালন বিষয়ক বিশ্বস্ত গ্লানি ... এবং ...
তাঁকে আমি প্রলোভন বলতে পারি না!

কেননা এই দহন অভিজ্ঞতার আলোকে, ঘাতকতা আর ষড়যন্ত্রের দিনগুলি ভুলে যেতে চাই...

ভুলে যাওয়া মাত্রই অমীমাংসাসূত্র,
ভবিষ্যতের সম্ভবনাময় শুকনো বীজপত্র...
এমনই ধুলোমেঘ থেকেই মনোভূমির উপাদান অঙ্কুরিত হয়...
এই সামান্য জীবনচর্চায় এটুকুই আমার বিশ্বাস...

দুই প্রেমিকের সংলাপ

রিমি মুৎসুদ্দি

ছেলে : নীল শাড়িটা পরে ঐ আলপথ দিয়ে তুই যখন হেঁটে আসছিলি
মনে হচ্ছিল যেন কোনো নদী এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে!

মেয়ে : আমি নদী হতে চাই নাই

ছেলে : কিন্তু তুই তো আমার নদী,
যে নদীর বুক জুড়ে আদরের সাম্পান ভাসাই!

মেয়ে : হতাম যদি সত্যিই আমি একটা নদী,
তুই কি তাহলে শুধুই আমার বুকে ভাসাতিস তোর তরী?

ছেলে : বিশ্বাস হয় না, তোর আমাকে?

মেয়ে : আচ্ছা, সত্যিই যদি আমি নদী হতাম,
সময়ের পলি জমতে জমতে একটু একটু করে শুকিয়ে যেতাম!
অথবা, জোর করে আমাকে বাঁধ দিয়ে ধর্ষণ করত সভ্যতা,
আমার উন্মুক্ত গতিপথ, আটকে অন্ধকার টানেলে পতিত করত,
আর আমার নীল জলরাশি হয়ে যেত নোংরা কাদা-মাখা ঘোলাটে
আমৃত্যু বয়ে নিয়ে যেতাম সভ্যতার অভিশাপ!

ছেলে : (সজোরে মাথা নেড়ে) নাঃ! আর সহ্য করতে পারছি না!
তুই কক্ষনো নদী হবি না!

[মেয়েটা, ছেলেটার হাতে হাত রাখে। ছেলেটা মেয়েটার দিকে তাকায়।]

ছেলে : তার চেয়ে বরং তুই একটা গাছ হতিস!
পাখি হয়ে তোর ডালে বাঁধতাম বাসা।

মেয়ে : আর যখন আমাকে কেটে উঠত কংক্রিটের পাহাড়?

ছেলে : (মুচকি হেসে) তা কেন? তুই তো হবি কোন গহীন অরণ্যের গাছ!
তোর পাতার খসখসানিতে ঠিক তোকে চিনে নিতাম,
মানব-সভ্যতার থেকে অনেক অনেক পুরাতন বনস্পতিদের মাঝে
বাসা বাঁধতাম, খড়-কুটো দিয়ে তোর ডালে সাজাতাম আমাদের সংসার!

মেয়ে : তোর সে গভীর অরণ্য করতে অধিকার
জনপদ গড়ার নেশায় মত্ত মানুষ, যখন আগুন জ্বালিয়ে দিত?
একটু একটু করে পুড়তাম আমি পৃথিবীর সেই আদিম অধিবাসীদের সাথে,
তুই কি তখনও থাকতিস ডানা মুড়ে?

ছেলে : হ্যাঁ থাকতাম। শেষ পর্যন্ত থাকতাম!

মেয়ে : মানুষের ড্রয়িংরুমে তখন—দাবানল, গ্লোবাল-ওয়ার্মিং
ক্ষয়ক্ষতিহীন ভাবে সব সামলে নেওয়ার আত্মদম্ভ!

আকাশ তবুও যে বদলায়নি...

যশপাল সিং

তোমাকে যতই লিখি
চায়ের চুমুকে চুমুকে
কেমন যেন একটা বন মানুষী ভাব,
ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে চলার হৃদয়কম্পা দাবানল
ধোঁয়াশায় হাত পেতেও অথৈ জলে প্রমাণ রাখে এই শরীর।

একটি পঙক্তির সন্ধানে
গোলক ধাঁধায় খুঁজছে সময়, কথা
রংচটা আবিরে ভেসে আলোর রোশনাই
যেন সূর্যের চাঁদ চেহারা,
জ্যামিতিক নিয়মে কত ক্ষুধা ঘুমিয়ে পড়ে!

রুক্ষ কল্পিত কবিতার ঘাসে ঘাসে শুধু স্বপ্ন
অন্ধবিন্দুতে আশৈশব তর্কের নবান্ন, মৌনতার মাঝে
নির্জলা কবিতার উঠোন ভরা আল্পনায়
কেউ লিখে যায় জীবনের হালখাতা,
শৈশব-কৈশোরের আকাশ তবুও যে বদলায়নি...

দুটি কবিতা

তন্ময় ভট্টাচার্য

অ্যাডমিরেল

ইতিহাসমতে, কবিতা আমার কর্ম না
রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠে নামলেই সর্বনাশ

প্রত্যেক মোড়ে সমাজবাহিত চোর-পুলিশ
অপেক্ষা করে, ভয়ে-ভয়ে তাই চোখ খুলি

খুলেই দেখছি পতাকা এবং শব হাতে
অকল্পনীয় পুতুল চলছে মৌতাতে

চলছে, আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে সিগন্যালে
একটা পাগল, দিনদুনিয়ার অ্যাডমিরেল...

বড়ো শান্তিতে ঘুমোচ্ছে; আর কিচ্ছু না...

থমকে দাঁড়িয়ে কবিতাধর্মী বিচ্ছুরণ

বিফল

পোড়ার জন্য রোজ হাজার হাজার মৃতদেহ
উঠছে বসছে আর টিপসই দিচ্ছে কপালে

যাবতীয় সন্দেহ
মনের মধ্যে পুষে অকালেই যাদের হারালে

কিছুটা জনান্তিকে
জমা পড়ে সব অপব্যয়

কী লাভ কবিতা লিখে
যদি না আগুনে কেউ হাত সেঁকে নেয়

ভাঙনের পর

১
শান্ত হতে আমারও আজ আপত্তি নেই ভাঙবে যখন, নিপুণ হাতে ভাঙাই ভালো
হাসছে যারা, হাসতে থাকুক। কী আসে যায় আমরা জানি, ভেতর-ভেতর কে পাল্টালো...
২
হওয়ার ছিল, হওয়ার ছিল। বদলাবে কে আর কিছুদিন বাঁচাই যেত সঙ্গে থেকে
কিন্তু যাদের মিথ্যে ভীষণ জনপ্রিয়, কয়েকশো লাভ-ক্ষতির মধ্যে বাড়তে দিও...
৩
অবাক, তোমায় নাই বা পেলাম ওষ্ঠাগত ভুল চিনেছে দীর্ঘদিনের অভ্যাসিনী
বৃষ্টি তুমুল নামার আগেই সামলে নিতো—এমন করুণ সার্থকথা আর দেখিনি...
(৪)
নিজের মতো চলতে থাকাই স্বর্গারোহণ—এই অজুহাত সর্বদা নাও মানতে পারো
চোখের মধ্যে কাঠফাটা রোদ অসহ্য খুব 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছো' আবারও?
(৫)
তোমার বন্ধুভাগ্য ভালো। হতেই পারে তোমার জন্য অনেকে প্রাণ ছাড়তে রাজি
বর্শাফলক এই জমানায় নিয়ন্ত্রিত দুশ্চরিত্র নাম কিনেছে, যে গরহাজির...
(৬)
ব্যক্তিগত স্পর্শ থেকে সমস্ত রাগ ঝরবে জানি খেজুরগাছের দু'হাত জুড়ে
সাবধানে নয়; পতনশীল এক মন্ত্র দিও মর্মাহত মানুষ'কে চাই, রাতদুপুরের...
(৭)
নিয়ম মানো, বাড়িয়ে দাও অশ্রাব্য গাল আদর ভেবে ভুল করাটাই সঙ্গে থাকুক
ঠিক শুনেছো। গণ্ডি কেটে দিচ্ছে কপাল বন্যাকাতর ত্রাণ যেরকম, দর্শনে সুখ...
(৮)
একঘরে হোক আমাদের এই বদলে যাওয়া—জলের অভাব, আনাজও নেই ভাঁড়ারঘরে
দু'এক টুকরো অশান্তি, নিঃসঙ্গ হাওয়া নিজের সঙ্গে নিজেই তখন তর্ক করে...
(৯)
আর কিছুদিন... সামলে নেবে সমস্তটাই ভুলেও যাবে কে ছিল কোন জন্মে ছিল
পা মিলিয়ে চলতে আমার ভালোই লাগে কার্যালয়ে রাত নেমেছে; শেষ মিছিলও...
(১০)
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এবার অগ্রগতি পিছনদিকে কে আর চলতে চায় সহজে
একটা গলি অন্ধ হলে কীসের ক্ষতি আমার মধ্যে ভুল লোকেরই তোমায় খোঁজে...

বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আশ্রম-ভিত্তিক। মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমরা যা বুঝি প্রাক বৌদ্ধ যুগে সেরকম কোনো প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে ছিল না। তক্ষশিলা, কাশী, কনৌজ, মিথিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানের যে শিক্ষাব্যবস্থা ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছে সেগুলি ছিল বহু পণ্ডিতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষাব্যবস্থা। রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে শিক্ষাব্রতীগণ কোনো একটি জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করে শিক্ষাকার্য চালাতেন। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাদানের ব্যাপারে পণ্ডিতগণ পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেন। এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রথম দেখা যায় বৌদ্ধ যুগে। নালন্দা, বালভি, বিক্রমিশলা প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছিল প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা।

প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়েছিল তার কোনোটাই বঙ্গদেশে ছিল না। ইংরেজ আমলের আগে পর্যন্ত আমাদের এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত টোল, চতুষ্পাঠী পাঠশালা নির্ভর। স্থানীয় সমাজপতিগণ এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ প্রদান এবং অর্থ সাহায্য করলেও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। তাই পঠনপাঠনের পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু সবই হত গুরুমশায়দের নিজস্ব চিন্তাভাবনা নির্ভর। ফলে পড়ুয়াদের বোধশক্তি বিকাশের পরিবর্তে অনেক সময় মানসিক সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পেত।

এদেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ইংরেজ আমলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৮১৩ সালে কোম্পানি সনদে ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়। কিন্তু শিক্ষাদানের পদ্ধতি চড়ান্ত করতে না পারায় এই প্রস্তাব ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে পুরো ব্যাপারটাই তখনকার মতো ধামাচাপা পড়ে যায়।

সরকারি উদ্যোগ থমকে যাওয়ায় এদেশে আধুনিক শিক্ষাপ্রসার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তা দেখে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার সহ কতিপয় বিত্তশালী এবং প্রগতিশীল ব্যক্তি ইউরোপীয় ভাবধারায় শিক্ষাদানের তোড়জোড় চালাতে শুরু করেন। পরিকল্পনামাফিক ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। এর পরেই ব্রিটিশ সরকার নড়েচড়ে বসে। এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার প্রসার যাতে না ঘটে তাই সংস্কৃত শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ১৮২৪ সালে সরকারের উদ্যোগে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সমর্থকরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

পরবর্তীকালে সরকারি এবং বেসরকারি স্তরে বেশ কিছু বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় শিক্ষা শেষে অভিজ্ঞানপত্র প্রদানে সমস্যা দেখা দেয়। ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতি চালু করতে হলে এদেশে ওখানকার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন, কথা জানিয়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই 'উডস্ ডেসপ্যাচ'-এ যে সুপারিশ করেন সেই অনুসারে ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনানুসারে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের ডিগ্রি প্রদানের অধিকার পায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে যে ৩৯ জন সদস্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট গঠিত হয় তাঁদের মধ্যে মাত্র ৬ জন ছিলেন ভারতীয়। এরা হলেন—প্রসন্ন কুমার টেগোর, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, রমপ্রসাদ ঘোষ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মৌলবী মুহম্মদ ওয়াজী।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যকলাপের পরিধি ছিল সীমিত। শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে এগুলি হয়ে উঠেছিল পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি বিতরণের কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য যে এমনতর হবে তার আভাস উডস ডেসপ্যাচেই ছিল—

''The Universities were to be established not so much to be in themselves places of instruction as to test the values of the education obtained elsewhere.''*

[*Hundred years of the University of Calcutta]

জন্ম বিকলাঙ্গ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সুস্থ সবল করে গড়ে তোলার দায়িত্ব যিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি হলেন বিখ্যাত চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং জগত্তারিণী দেবীর পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন সোমবার শেষরাত্রি। বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনে তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতার ফসল আজও আমরা উপভোগ করি। তাঁরই হাতের যাদুদণ্ডের স্পর্শে রোগমুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সেজে ওঠে নবরূপে, নবসাজে। একাজ করতে তাঁকে বহুক্ষেত্রে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যতই বাধা আসুক, সংকল্পে অটল ছিলেন এই বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষটি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতিভার যাতে যথাযথ স্ফূরণ ঘটে সেদিকে পিতা গঙ্গাপ্রসাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। আগেই বলেছি পিতা ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও পুত্রের লেখা-পড়া, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি সব বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। আশুতোষের মানসিক গঠনেও তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলজীবন শুরু হওয়া থেকেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আসুতোষের বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল। তাই ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাচিন্তার যথাযথ রূপদানের জন্য। আর তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে 'ফেলো' মনোনীত হবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মিঃ ইলবার্ট। আশুতোষের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয় ১৮৮৯ সালের ১৬ জানুয়ারি।

অশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের একটা বড়ো অংশ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর সহজাত। স্বাধীনতা ছিল তাঁর জীবনের পাথেয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সময় তাঁর এই গুণগুলি সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়। শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনাই ছিল শেষ কথা। এ ব্যাপারে তিনি কারও সঙ্গে আপোসে রাজী ছিলেন না। ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ উপাচার্য পদে বৃত হবার পর তাঁর লক্ষ ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্র গড়ে তোলা। এই কাজে তাঁকে বহু বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি অবশ্য সেসব দৃঢ় চিত্তেই মোকাবিলা করেছিলেন। যেকোনো সমস্যাই তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতেন। উপাচার্য পদে নিযুক্ত হবার পর তাঁর প্রথম কাজ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন নিয়মাবলী রচনা করা। এরজন্য তিনি সময় পেয়েছিলেন মাত্র চার মাস। শুধু তাই নয়, এই নিয়মাবলী তাঁকে রচনা করতে হয়েছিল ১৯০৪ সালে প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকে সামনে রেখে। যদিও একসময় তিনি এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রতিকূল অবস্থা থেকে কীভাবে মণিমুক্তা আহরণ করতে হয় তা তাঁর জানা ছিল। তাই বিরোধী আইনকে সামনে রেখে নতুন নিয়মাবলী রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সেদিন যে শিক্ষাসংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার পিছনে ছিল তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা ও দূরদর্শিতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আশুতোষের কাছে ছিল দেব দেউলের মতো। আর তিনি ছিলেন এই মন্দিরের

পূজারী। পূজার জন্য প্রতিটি ফুল বাছার সময় তাঁর ছিল সযত্ন প্রয়াস। ১৯০৬ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি একটি জন্ম-বিকলাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে সুস্থ, সবল করে দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ধ্যানধারণা কেমন ছিল তা জানা যায় তাঁর সমাবর্তন ভাষণগুলি পর্যালোচনা করলে। যেমন—

- শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র অপরিহার্য।
- বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।
- স্কুল, কলেজে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত।
- আদর্শ ছাত্র গড়ার জন্য আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্য প্রয়োজন।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে একটি আদর্শ জাতি গড়ে তোলা।
- শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা থাকা অনুচিত।
- উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।
- ছাত্রদের মূলমন্ত্র অধ্যয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি অনভিপ্রেত।
- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হবে পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত।

উপরোক্ত বিবৃত বিষয়গুলি থেকে বোঝা যায় শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা কতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিল।

একটি ইমারত গড়তে হলে যেমন নীচু থেকে ইটের পর ইট সাজিয়ে উপরে উঠতে হয় তেমনি একজন আদর্শ ছাত্র তৈরি করতে হলে তাঁর শৈশব থেকেই যত্নবান হতে হয়। ইমারতের ভিত যদি নড়বড়ে হয় তাহলে সেটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কোনো শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা যদি অসম্পূর্ণ থাকে তবে সে আদর্শ ছাত্র হতে পারে না। গোড়া থেকে যদি শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিহীন না হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই শিক্ষাসংস্কারক আশুতোষ তাঁর কর্ম প্রয়াসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে স্কুল, কলেজ স্তরেও বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। সে সময় স্কুলগুলির অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে সেগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—''They are without exception undermanned, of libraries and laboratories there are only few which can satisfactorily stand the scrutiny of most reasonable test.''#

[# শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি, পৃ. ৭৯]।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে এমন চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া যায় না।

অশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা শুধু তত্ত্বকথাতেই আবদ্ধ ছিল না। প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি কতটা সচেষ্ট ছিলেন তা তাঁর কর্মজীবন থেকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর কর্মপ্রয়াসের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল—কেন্দ্রীয় আইন ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, উন্নত ছাত্র ও অধ্যাপকদের গবেষণার ব্যবস্থা ও ভারতীয় ভাষার উন্নয়ন।@

[@ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ]

উচ্চশিক্ষা প্রসারে তিনি প্রথমেই বেছে নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে আইনের পঠনপাঠন। ১৮৫৪ সালে ডেসপ্যাচে আইনশিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ থাকলেও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী উপাচার্যদের মধ্যে কেউই

এনিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা করেননি। আইনের পঠনপাঠন সম্পর্কে ডেসপ্যাচে যা বলা হয়েছিল তা হল—''It will be advisable to establish in connection with the Universities, Professorships in various branches of learning and the most important of those branches in law.''[$]

[$ Wood's Education Despatch, 1854]

১৯০৮ সালে স্যার আশুতোষ এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং বিষয়টি সিন্ডিকেটে বিবেচনার জন্য পাঠান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আইন ব্যবসা নয়, বিজ্ঞান। এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—''Law is neither a trade nor a solemn jugglery but a living science in the proper sense of the world.''

(আইন ব্যবসাও নয়, যাদুবিদ্যাও নয়, বরং এ এক জীবন্ত বিজ্ঞান)[&]

[& আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ; পৃঃ ১১৫]

অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯০৫ সালের ৫ জুলাই তিনি আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এরপরে তিনি আচার্য হার্ডিঞ্জ-এর সহযোগিতায় 'হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাস' তৈরি করেন। তিনি মনে করতেন ছাত্রাবাস ব্যতীত শিক্ষক ছাত্রের সাহচর্য বজায় রাখা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানে কোনো খাপছাড়া কাজের স্থান নেই। পারস্পরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে তার অগ্রগতি ঘটে। স্যার আশুতোষের কাজের মধ্যেও ছিল এই শৃঙ্খলপরায়ণতা। তাই ছাত্রাবাসের পরেই তিনি উদ্যোগ নিলেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং একটি মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯১২ সালে তৈরি হল দ্বারভাঙ্গা লাইব্রেরি বিল্ডিং এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাপাখানা যা পরবর্তীকালে কলকাতার অন্যতম বৃহৎ ছাপাখানায় পরিণত হয়।

কর্মযোগী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু করা। বহু ঝড়-ঝাপ্টা সামলে তাঁকে এই লক্ষে পৌঁছোতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি কলা বিভাগের অন্তর্গত নয়টি মুখ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞান বিভাগ তখনও খোলা সম্ভব হয়নি। প্রধান কারণ ছিল অর্থাভাব। তাই তাঁর মন কিছুটা অতৃপ্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় বলেছিলে—

''No university is now-a-days complete unless it is equipped with teaching faculties in all the more important branches of the Science and Arts and unless it provides ample opportunities for research.''**

[** Convocation Address, 1912]

তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন করার স্বপ্ন পূরণ হবে না? এদিকে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। সরকারও তাঁর উপর বিরূপ। অতএব তৃতীয়বার উপাচার্য পদে আসীন হবার সম্ভাবনা তাঁর নেই। ব্রিটিশ সরকার চাইছে না এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটুক। তাই সরকারি তরফে অর্থ সাহায্যেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। হতাশা তাঁকে ক্রমশ গ্রাস করছে। বহু বিনীদ্র রজনী কাটিয়েও কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছেন না। একজন বিজ্ঞান সচেতন মানুষের কাছে এ যে কত বড়ো বেদনাদায়ক তা সহজেই অনুমেয়।

অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন হবে না? আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন পূরণ হবে না? এটা মেনে নিতে পারেননি দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানমনস্ক হিতৈষী। স্যার তারকনাথ পালিত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, খয়রার রানী বাগীশ্বরী দেবী ও কুমার গুরুপ্রসাদ সিং, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা এগিয়ে এলেন অর্থ সাহায্য নিয়ে। বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের কর্মযজ্ঞ আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হল। উপাচার্য হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কার্যকাল শেষ হতে চলেছে। সময় কম। তাই যত দ্রুত সম্ভব

পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হবে। অবশেষে কার্যকাল শেষ হবার মাত্র চারদিন আগে অর্থাৎ, ১৯১৪ সালের ২৭ মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হলেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তিনি বাকী কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রাক্তন উপাচার্যের সাহায্য চাইলেন। কর্মই যাঁর জীবনের ব্রত, বিশ্বের দরবারে ভারতীয় বিজ্ঞানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা যাঁর লক্ষ তিনি কি পারেন এই আহ্বান দূরে সরিয়ে রাখতে? সানন্দে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন নতুনের দিকে। স্বপ্ন পূরণ হল। শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের পঠনপাঠন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে লোকে শিক্ষাবিদ বলেই জানেন। অথচ গণিতশাস্ত্রে তাঁর যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তা অনেকেরই অজানা। ছাত্রজীবনেই তাঁর গণিতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা জন্মেছিল। মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির উপপাদ্য-২৫ (theorem-25)-এর একটি নতুন প্রমাণ উদ্ভাবন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে তিনি এই সমাধানটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক বুথ সাহেবকে দেখান। প্রমাণের মৌলিকতা দেখে বুথ সাহেব বিস্মিত হন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় উৎসাহী হয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত গণিতের সুবিখ্যাত পত্রিকা 'কেম্ব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথেমেটিকস' (Cambridge Messenger of Mathematics)-এ পাঠিয়ে দেন। যথাসময়ে সেটি প্রকাশিতও হয়। শোনা যায়, সমস্যাটির সমাধান করার সময় রাত জাগার কারণে আশুতোষ বাবার কাছে ধমক খেয়েছিলেন। না ঘুমিয়ে বালক আশুতোষ যখন সমস্যাটি নিয়ে ভাবছিলেন তখন তাঁর বাবা তাঁর কাগজ ও কলম কেড়ে নেন। আর কোনো উপায় না দেখে তখন তিনি ঘরের মেঝেতে চক দিয়ে সমস্যাটির সমাধান করে ফেলেন। উপপাদ্য-২৫ এর সমস্যাটা ছিল এই রকম :

"যদি দুটি ত্রিভুজের একটির বাহু অপরটির দু'টি বাহুর সঙ্গে পরস্পর সমান হয় এবং প্রথটির তৃতীয় বাহু দ্বিতীয়টির তৃতীয় বাহু থেকে বড় হয়, তবে প্রথমটির তৃতীয় বাহুর বিপরীত কোণ দ্বিতীয়টির অনুরূপ কোণের চেয়ে বড় হবে—প্রমাণ কর।"

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল শৈশব থেকেই। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ এ পড়ার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অবস্থাতেই তিনি পরীক্ষায় বসেন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এর পরে বি এ-তে ভর্তি হন। সে সময় বি এ-তে দুটি কোর্স ছিল—'এ' ও 'বি'। 'এ' কোর্সটিতে ছিল সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি, আর 'বি' কোর্সে ছিল বিজ্ঞান। যে যুগেও এবং এ যুগেও সকল ছাত্রছাত্রীই যেকোনো একটি কোর্সেই বি এ পরীক্ষায় বসেন। আশুতোষ ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি দুটি কোর্সেই পরীক্ষায় বসেন এবং দুটিতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর এম এ-তেও প্রথম স্থান। সিটি কলেজ থেকে 'ল' পাশ করার পর 'ডি এল' (ডক্টরেট ইন 'ল') উপাধি পান।

১৮৮৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে Plane Analytic Geometry-র উপর তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ সালে ''An Elementary Treatise on Geometry of Conics'' নামে তাঁর একখানি বই প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে আছে অধিবৃত্ত, উপবৃত্ত ও পরাবৃত্ত সংক্রান্ত ৯৭টি প্রতিজ্ঞা ও ৮০০-র উপর অনুশীলনী। এছাড়াও তিনি ইউক্লিডের বই-এর অনুশীলনীগুলি সমাধান করে 'Exercises of Euclid'' নামে একখানি বই রচনা করেছিলেন। যদিও বইটি তিনি ছাপার অক্ষরে দেখে যেতে পারেননি।

একটি বিদেশী গণিত পত্রিকায় তাঁর পাঠানো নানা ধরনের দশটি সমস্যার সমাধান প্রকাশিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পত্রিকাটি লিখেছিল—'আশুতোষ সমাধান দিয়েছেন।'

স্থানাঙ্ক ও অবকল জ্যামিতিতে ও উচ্চতর গণিতে তাঁর লেখা বাইশটি প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে।

তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির কয়েকটি হল :

- মেসেঞ্জার অফ ম্যাথেমেটিকস (Messenger of Mathematics)
- অন মঙ্গেস ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন অফ অল কনিকস (On Monges Differential Equation of All Conics)
- অ্য জেনারেল থিওরেম অন দি ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন অফ ট্রাজেক্টরিস (A General Theorem on the Differential Equation of Trjectories)
- অন দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন অফ অ্য ট্রাজেক্টরি (On the Differential Equation of a Trajectory)
- অন পোঁয়াসো ইন্টিগ্রাল (On Poiswson's integral)
- অন অ্য কার্ভ অফ অ্যাবারেন্সি (On A Curve of Aberrancy)।
- অ্য মেময়ের অন প্লেন অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি (A Memoir on Plane Geometry)।
- রিমার্কস অন মঙ্গেস ইকোয়েশন টু অল কনিক্স (Remarks on Monge's Equation to All Conics)।
- অন সাম ডেফিনিট ইন্টিগ্র্যালস (On Some Definite Intigrals)।
- অন দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন অফ অল প্যারাবোলাস্ (On the Differential Equation of All Parabolas)।
- দ্য জিওমেট্রিক ইন্টারপ্রিটেশন অফ মঙ্গেস ডিফারেনশিয়াল একোয়েশন টু অল কনিকস্ (the Geometric interpretation of Monge's differential equation to all Conics)।
- সাম অ্যাপ্লিকেশনস অফ ইলিপটিক ফাংশনস টু প্রবলেমন অফ মিন ভ্যালুস (Some applications of Elliptic functions to problems of mean values)। ইত্যাদি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় বিষয় গণিত হলেও অন্যান্য বিষয়ে তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। ইংরেজি, সাহিত্য, সংস্কৃত, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি সব বিষয়ই তিনি সমান আগ্রহে জানার চেষ্টা করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আগে দুটি বিষয়ে কেউ এম এ করেন নি। অঙ্কে এম এ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। পরে পদার্থবিদ্যাতেও এম এ করেন। পেয়েছেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপ। এছাড়াও দেশে বিদেশে তিনি নানা সম্মানে ভূষিত হন। যেমন—

- সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল (যদিও কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত ডিগ্রি তাঁর ছিল না)। তাই দেশের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাঁকে 'বাচস্পতি' ও 'সরস্বতী' নামে অভিহিত করেছিলেন।
- মহীশূরবাসীরা তাঁকে 'বিদ্যার্ণব' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
- শ্রীলংকাবাসীরা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে 'সম্বুদ্ধগমচক্রবর্তী উপাধি দ্বারা ভূষিত করে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।
- এডিনবরা রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

তথ্যসূত্র :

১. Hundred years of the University of Calcutta
২. Representative Indians—Syamaprasad Mukherjee
৩. A Nation in the Making—Sir Surendranath Banerjee
৪. Asutosh Mukhopadhyay—A. P. Dasgupta
৫. Journal of the Asiatic Society.
৬. (Builders of Modern India) Asutosh Mookherjee—Sasadhar Sinha
৭. জাতীয় সাহিত্য—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৮. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ
৯. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন
১০.শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি
১১.আশুতোষের ছাত্রজীবন—অতুলচন্দ্র ঘটক
১২.শতবর্ষ স্মরণিকা—বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৮৭২—১৯৭২

বৌদ্ধ ও ইসলামের ধর্মপ্রচার

মৃণ্ময় চৌধুরী

(A Comparative Study)

৫৫০ B.C. ও ৫৫০ A.D. বুদ্ধদেব ও হজরত মহম্মদ : যুগান্তর কাল। দুজনেই সুবিশাল মাপের ধর্মপ্রচারক বা ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা। চীনের নাগরিকদের সামগ্রিকভাবে যদি বৌদ্ধ বলে অনুমান করা হয় তাহলে সংখ্যার ভিত্তিতে বৌদ্ধদের বিস্তার বিপুল জনসংখ্যার মাঝে। একদা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া এবং উত্তর এশিয়া শাক্যসিংহ গৌতমের পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল। ভারতও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের উত্থান ও অন্যান্য অভিঘাতের ফলে বৌদ্ধরা হীনবল হয়। ইসলামিক অভিঘাতের ফলে ভারতে বৌদ্ধরা সংকুচিত হয়ে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়, যা এখনো বর্তমান। তবে তিব্বত, চীন, শ্রীলঙ্কা, উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়া, মায়ানমার, জাপানসহ বহু দেশে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যদিকে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশসহ প্রায় ৫৭টি দেশে ইসলাম এক স্পষ্ট মাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে বলা যায় ইসলামিক জনসংখ্যাও সবিশাল। জনসংখ্যার ভিত্তিতে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, তারা প্রায় জনবিস্ফোরণের মাধ্যমে খুঁজে নিয়েছে আপন পথ, ইউরোপেও দ্রুত বাড়ছে ইসলামের সংস্পর্শ। সেই অনুপাতে না হলেও ভারতে ইসলামের বৃদ্ধির হার যথেষ্ট। কারণ, সন্তান-সন্ততি পালনে ইসলামের সমতুল্য বিশ্বে কেউ নেই। এই দুই মহান ধর্মের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বৌদ্ধ ধর্মে গৌতম পরবর্তী সময়ে ধর্মপ্রচারকরা ছিলেন মূলত Monk বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত; তাঁদের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নামেই অভিহিত করা হত। তাঁরা দুটি উপায়ে ক্রিয়াকলাপ সাধন করতেন; এক, রাজদরবারে, আরেক, জনগণের মাঝে। প্রথমত, তাঁরা রাজদরবারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে যাতায়াত করতেন ও ক্রমে ক্রমে রাজা ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের নিজ মতের বশবর্তী করবার চেষ্টা করতেন। সেই ক্রিয়া সাধন হত উপদেশ, জাতককথা, নীতিকথা, উন্নত নৈতিক চরিত্র আদর্শ, বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে, আর প্রাণপণে যুদ্ধ, রক্তপাত, বিশৃঙ্খলাকে পরিহার করবার মহৎ চেষ্টা সাধন করতেন ও তাঁদের উপদেশেও তার reflection বা প্রতিফলন থাকত। এইভাবে রাজশক্তিকে প্রভাবিত করে নিজমতে নিয়ে আসতে পারলে, তাঁদের উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্য সুউচ্চ স্তূপ, প্যাগোডা, ভাষণমঞ্চ এবং জনসাধারণের জ্ঞানের উন্মেষের জন্য Academic Institutions (অবশ্যই রাজনুগ্রহে), যেমন নালন্দা, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা University বা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতেন। এইখানে অধ্যাপক থেকে অধ্যক্ষ মূলত বৌদ্ধ আচার্যরাই হতেন এবং সেখানে বৌদ্ধধর্মের আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, সমাজবিজ্ঞান, কলাবিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান, গতি, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যয়ন হত। এই উপায়ে তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তার করতেন। ধীরে ধীরে বেদ ভিত্তিক ধর্মের অসারতা, চতুরাশ্রম প্রথা, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ইত্যাদির বিরোধিতা এক বলিষ্ঠরূপ গঠন করল। এইভাবে তাঁরা রাজা, অভিজাত, নাগরিক ও আপামর জনসাধারণের মনে দৃঢ়তার সাথে বৌদ্ধবাদকে স্থাপন করতেন। যদিও প্রথম দিকে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ব্যপ্ত ছিল (যেখানে বুদ্ধদেবের বিগ্রহের উপাসনা করা হত না, বুদ্ধ বা জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হত), তবুও সনাতনধর্মের সাথে অবিরাম

অভিঘাতের ফলে হীনযান বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে (মূলতঃ 'বেদ'র থেকে ভিন্নতা বজায় রাখার জন্য বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা শুরু হয়, যা আবার সনাতন ধর্মেরই contemporary রূপ বলা যায়)। হীনযান বৌদ্ধ ধর্মই ক্রমশ বৌদ্ধদের প্রধান wing-এ পরিণত হয়। এর পৃষ্ঠে ভর করেই দক্ষিণ এশিয়া এবং তিব্বত-চীন সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। হীনযানদের মধ্যে তন্ত্রপীত হিন্দু ধর্মের প্রভাব পড়তে শুরু করলে—সাধনযান, সহজযান, বজ্রযান, বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি বিকাশ লাভ করে, এদের প্রাধান কার্যালয় বা headquarters হয়ে ওঠে তিব্বত, যা আবার চীনা নাম দিয়ে হিন্দু দেবী (তারা, কালী ইত্যাদি) উপাসনার অঙ্গ হয়ে যায়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে অন্তত ভারতে বৌদ্ধ আগ্রাসনের মূলে কুঠারাঘাত করে। তিনি খোদ বুদ্ধদেবকেই বিষ্ণুর নবম অবতার ঘোষণা করেন; দ্রুততার সাথে বৌদ্ধরা সনাতনধর্মের সাথে একাত্মবোধ করে মিলেমিশে যেতে তাকে। এই যুগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু-বৌদ্ধ conflict of interest বা স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়। তা মূলতঃ রাজন্যবর্গের মাঝে। ছোট-বড় কিছু যুদ্ধবিগ্রহ ছিল এই যুগের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা কিন্তু এইসব যুদ্ধের প্রভাব আপাতভাবে নাগরিক বা রাষ্ট্রের প্রজাদের উপর পড়ত না। মূলতঃ বৈচারিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও অবিরাম সনাতনধর্মের সঙ্গে অভিঘাতের ফলে বৌদ্ধরা ভারতে হীনবল হতে থাকে। আরবের মাটি থেকে উঠে আসা ইসলাম বাদবাকিটা পূরণ করে দেয়। বৌদ্ধরা আজ ভারতে অত্যন্ত সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী রূপে বিরাজমান। তবে ভারতের বহির্ভাগে তার ব্যাপ্তি আজও ব্যাপক।

ইসলামের উত্থানের মূলতঃ দুটি wings : তরবারি আর পবিত্র কোরান (যা মুসলমানদের জীবনশৈলীকে dictate করে)। হজরত মহম্মদ মদিনা শহরে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তাঁর অনুগত ও ইসলামের প্রতি অনুগত বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। মক্কার বাসিন্দাদের সঙ্গে মদিনাবাসীর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে, মক্কা থেকে বিতাড়িত হজরত মহম্মদকে মদিনা আশ্রয় প্রদান করে। মক্কার বাসিন্দারা হজরতের ধর্মকে মেনে না নেওয়ার ফলে, তিনি মদিনা থেকে ইসলামের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন এবং মক্কা অভিযান করেন।

মক্কা প্রাক-ইসলামিক যুগ থেকেই ওই অঞ্চলে আধ্যাত্মিকতার স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা মহম্মদের দখলে এলে সেখানে তা ইসলামিক ধর্মপ্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমগ্র আরবের রাজনীতি মূলত ছিল বংশভিত্তিক, বা বলামাত্র গোত্রভিত্তিক, এই গোত্র প্রাধান্যতাকেই ইসলামিক যুগের পারস্যের নেতারা প্রধান হাতিয়ার করে, ফলে সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্যে বিভিন্ন বংশকে পরাজিত ও স্বধর্মে নিয়ে আসার মাধ্যমে প্রারম্ভিক ইসলামের বিজয় অভিযান শুরু হয়; যা ক্রমশঃ ব্যপ্ত হয়ে আরবভূমি অতিক্রম করে পারস্যে (অধুনা ইরাক-ইরান-সিরিয়া) ছড়িয়ে পড়ে। তা মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে আরো পশ্চিমে ইসরাইল, মিশর হয়ে তুরস্ক হয়ে ৭৫০ A.D.-র মধ্যে ইউরোপে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ পর্তুগাল, স্পেন নানা দেশে ইসলামের পতাকা উত্তোলন ঘটে এবং অর্ধেক গলদেশ (অধুনা ফ্রান্স) তাদের অধিকারভুক্ত হয়। এই অবস্থায় ইউরোপের খ্রিস্টান জনসাধারণ রাজা-জমিদার-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বড় কৃষক নিজ সেনাবাহিনীকে একত্র করে, এক ছত্রের তলে এনে, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের আহ্বান দেয়। ৯০০ A.D. নাগাদ এই ধর্মযুদ্ধ ইউরোপের মৃত্তিকা ছাড়িয়ে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে ও তা ব্যাপক আকার লাভ করে। জেরুসালেমের যুদ্ধে ইসলামিক শক্তির সশস্ত্র সামরিক পরাজয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। এই ভাবে পশ্চিমে অবরুদ্ধ হলে পূর্ব ইসলামিক সাম্রাজ্য বা ইরানের সীমান্ত থেকে ইসলামের বৃদ্ধি বীজ বপণ হয়। ইসলামিক শাসকেরা ক্রমশঃ ভারতের পশ্চিম দিকে পাঞ্জাব, সিন্ধু জয় করে শেষমেশ ১২০০ A.D. নাগাদ থানেশ্বর (দিল্লি) দখল করে। এই ইসলামিক ধর্মজয়যাত্রার প্রধান দিক আক্রমণের পর রাজা,

রাজকর্মচারী, সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের সামগ্রিকভাবে ইসলামে রূপান্তরিত করা ও এরপর প্রজাকুলকে রূপান্তরিত করা বা দুটো কর্মই একসাথে সম্পন্ন করা। যেহেতু মধ্যযুগে প্রজাদের রাজার শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না, সেহেতু এই রূপান্তরকরণের কাজ খুব দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতে পৌত্তলিকতাবিরোধী ইসলামিক অবস্থানের জন্য ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে প্রায় ৮০০-৯০০ বছর ধরে টানা যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে যা এখনো যে শেষ হয়েছে তা একদমই বলা যায় না। ভারতের ক্ষেত্রেই একমাত্র যে শাসন ক্ষমতা ইসলামিক শাসকদের দখলে এলেও বেশিরভাগ ভারতীয় তাদের প্রাচীন ধর্মকে ত্যাগ করেনি। ফলে শাসক ও শাসিতর সম্পর্ক ইসলামিক শাসনকালে ছিল তিক্ত; এ কথা বলাই বাহুল্য।

১৯৪৭ A.D. তে পাকিস্তান ও ভারত, ১৯৭১ A.D. তে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। তা সত্ত্বেও আজকেও ভারতে ১৭ কোটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করেন, যা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামিক জনসংখ্যা কোনো দেশে, প্রথম হলো ইন্দোনেশিয়া। ভারতের ধর্মসহিষ্ণুতা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বৌদ্ধধর্ম যেখানে ক্রমশ প্রাধান্য হারিয়েছে, সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে বিভিন্নভাবে।

বহুরূপী বাহিরজী নায়েক

শুক্লা মজুমদার

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় এক যুগপুরুষের উত্থান গাথা। তাদের জীবনধারা, বীরত্ব, রাজ্যজয়, চরিত্র, ব্যক্তিগত জীবন প্রভৃতি বহুবিধ কাহিনি আমরা পেয়ে থাকি এক একটি অধ্যায়ে। কিন্তু তাদের উত্থানের পেছনে যে সকল কারণগুলি থাকে সেগুলি, ইতিহাস খুব স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করে কখনো বা তা বিস্মৃতির আড়ালে নিজ অস্তিত্বের সংকটে ভোগে।

বাাহিরজী নায়েক ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের ইতিহাসে এমনই একটি অন্যতম কারণ যার বুদ্ধি ও সাহসিকতার ফল হিসাবে, শিবাজির মত যুগ নায়ককে ভারতের ইতিহাসে আমরা পেয়ে থাকি। শিবাজীর সামরিক কৌশল যা শিবসূত্র নামে খ্যাত তার অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন বাহিরজী নায়েক, শত্রুপক্ষের রণনীতি ও চক্রান্তের কথা আগের থেকে জেনে নিয়ে সেইমত যুদ্ধের নীতি নির্ধারণ ছিল শিবাজীর সামরিক কৌশলের অন্যতম ব্যতিক্রমী দিক। শিবাজী গুপ্তচরদের ওপর রাজকোষের বেশ বড় অংশ ব্যয় করতেন। বাহিরজী নায়েক ছিলেন শিবাজীর অন্যতম গুপ্তচর তথা পরামর্শদাতা।

তৎকালীন মহারাষ্ট্রের দুর্গম পার্বত্য জঙ্গলের এক আদিবাসী জাতি ছিল, "রামোসী" উপজাতি, দুর্গম এলাকার বাসিন্দা হওয়ায় তারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্ভীক হতেন। এক জঙ্গল পরিদর্শনের সময় শিবাজীর সাথে বাহিরজীর দেখা হয়। শিবাজীর ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে দৃষ্টি ছিল প্রখর ফলে এক সাক্ষাতে বাহিরজী নায়েক ও তার সেনাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন যা ছিল 'রামোসী" জাতির কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

শিবাজী বাহিরজীকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, শত্রুপক্ষের শিবিরের গোপন খবর আনার কাজে ব্যবহার করতেন, এবং বাহিরজী নায়েক বিভিন্ন ছদ্মবেশধরে সেই কাজ খুব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। তাই ইতিহাসে বাহিরজী "বহুরূপী" নামেও পরিচিত ছিল। শত্রুপক্ষের শিবিরে সরাসরি ঢোকার কাজটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু বাহিরজীর মত আদিবাসী যুবক শিবাজীর মত হিন্দু স্বরাজের স্বপ্ন দেখতেন, ফলে সেই কাজ করতে প্রাণের ঝুঁকি নেওয়াটা কোন বড় ব্যাপার ছিল না।

বাহিরজী নায়েকের পূর্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহে আমরা বাহিরজী নায়েকের কৃতিত্বের কথা জানতে পারি।

১৬৫৭-৬২ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহ পরলোক গমন করলে তার নাবালক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় মোঘল শাসনকর্তা ঔরঙ্গজেব বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, এই সুযোগে শিবাজী "জাওলী" নামক রাজ্যটি অধিকার করেন তিনি আহম্মদনগর রাজ্যের অন্তর্গত জুনার ও অপর কয়েকটি স্থানও দখল করেন। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব দিল্লি যাত্রা করেন, বিজাপুর মোগল আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শিবাজীর বিরুদ্ধে 'আফজল খাঁ"কে প্রেরণ করেন। "আফজল খাঁ" তৎকালীন সময়ে বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিল। কপটতা তার চরিত্রে ছিল ভরপুর। অনেক পূর্বেই শিবাজীর ভার্যকে তিনি হত্যা করেন ও বাবাকে বন্দী করেন।

আফজল খাঁ, শিবাজী অধিকৃত পণ্ডরপুর, তুলজাসুরের মন্দির ও ধর্মস্থানগুলিতে আক্রমণ করেন কারণ তিনি চেয়েছিলেন এই খবর শুনে প্রতাপগড় থেকে শিবাজী সমতল স্থানে নেমে আসবেন ও সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে শিবাজীকে তিনি পরাস্ত করবেন। শিবাজী সেই ভুল করেননি কারণ বাহিরজী ইতিমধ্যে আফজল খাঁর সেনা ছাউনিতে প্রবেশ করেন ছদ্মবেশে। সেখান থেকে তিনি শিবাজীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের খবর সংগ্রহ করেন

ও শিবাজীকে প্রেরণ করেন। ফলে শিবাজী সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে একটি চুক্তিতে আসার প্রস্তাব দেন আফজল খাঁকে। আফজল খাঁ সেই প্রস্তাবে রাজি হল এবং ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে ১০ই নভেম্বর শিবাজী কৌশলে "বাঘনখ" দ্বারা আফজল খাঁকে হত্যা করেন। এক বাহিরজীর পথনির্দেশিকা অনুসারে সেইস্থান তিনি দ্রুত ত্যাগ করেন। পরবর্তী ১৮ দিনে ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে প্রতাপগড় ও তার আশেপাশে বহুদূর্গ শিবাজীর দখলে আসে অনেকেই আফজল খাঁ হত্যার ঘটনায় ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করে দুর্গগুলি ছেড়ে দেন এমনকী বিশাল গড়ের দুর্গটিও শিবাজীর দখলে আসে, আদিল শাহের সেনারা আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে না নেমে শুধুমাত্র গুপ্তচরের দক্ষতার কারণে বিজয়পুরের সঙ্গে সরাসরি টক্কর দিয়েছিলেন শিবাজী।

এই ঘটনার পর ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে মুঘল সেনাপতি "সায়েস্তা খাঁ" পুণের লালমহল দখল করে নেন, লালমহলে শিবাজীর ছোটবেলার অনেকটা সময় কেটেছিল, ফলে ছোটবেলার বহু স্মৃতি জড়িয়ে ছিল লালমহলের সাথে। তাই লালমহল মুঘলদের দখলে যাওয়ার ঘটনাটি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি শিবাজী। লালমহলকে মুঘলদের হাত থেকে পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা শিবাজী করেন, এই পরিকল্পনাতেও বাহিরজী নায়েকের পরামর্শ বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। সরাসরি তৎকালীন মুঘল সেনাদের টক্কর দেওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না, পুরো শহর মুঘল সেনা কর্তৃক ঘিরে রাখা হয়েছিল ফলে বাহিরজীর পরিকল্পনামাফিক শিবাজী ও তার ৪০০ সেনা 'বরযাত্রীর" ছদ্মবেশে পুনেতে গভীর রাতে প্রবেশ করেন, তখন রমজানের মাস চলছিল, ক্লান্ত শরীরে গভীর রাতে সায়েস্তা খাঁ ও তার সেনা দেহরক্ষীরা নিদ্রারত ছিল, গভীর রাতের আকস্মিক আক্রমণের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে শিবাজী ও তার সেনারা লাল মহল পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন, এই ঘটনার ফলে সায়েস্তা খাঁ নিজ পুত্র ও নিজের একটি আঙুল খুইয়ে কোন রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন।

শিবাজীর মারাঠা সাম্রাজ্য সামরিক শক্তি ও কৌশলের ওপর টিকে ছিল। শিবাজীর অধীনে এক লক্ষ সৈন্যবাহিনী ছিল তাদের রক্ষণাবেক্ষণে বহু ব্যয় হত ফলে এক সময় ক্রমশ রাজকোষে ঘাটতি পড়ছিল। এই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য বাহিরজীর সাথে পরিকল্পনা করে সুরাট লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত নেন শিবাজী। সেই সময় সুরাট ছিল এক বন্দরনগরী, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র তাছাড়া হজযাত্রীদের কর থেকে বহুবিধ আয় হত সুরাটের, ফলে মারাঠাদের আর্থিক সঙ্কটের মোকাবিলার সুরাট লুণ্ঠনের বিকল্প ছিল না।

সুরাট লুণ্ঠনের পরিকল্পনার মূলনায়ক ছিলেন বাহিরজী নায়েক। এই সময় সুরাটের সুবেদার ছিল "ইনায়েত খান"। তিনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, এই খবর বাহিরজীর কাছে ছিল। ফলে বাহিরজী ও তার সঙ্গীরা তৎকালীন এক গায়ক সম্প্রদায় "গোন্দড়ের" ছদ্মবেশে সুরাটে ঢোকেন এবং সুরাটের ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তৃতি, ধনসম্পত্তি, রাস্তাঘাট এমনকী সুরাটের কোন ব্যক্তি কত সম্পত্তির অধিকারী সে সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে শিবাজীর কাছে প্রেরণ করেন। ফলে শিবাজী ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে সুরাট আক্রমণ করে সুরাট লুণ্ঠনে সফল হন। এরপর বাহিরজী নায়েক শিবাজী কর্তৃক "সরতাজ" উপাধি লাভ করেন।

উপরে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহগুলি, মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে বাহিরজীর অবদান ইতিহাস স্বীকার করে (বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে)। তবে এরপরেও শিবাজীর বহু জয় পরাজয়ের ছায়াসঙ্গী বাহিরজী ছিলেন তা বলাইবাহুল্য।

বর্তমানে মহারাষ্ট্রের মোঙ্গলি রাজ্যের "বানুর গড়ে" বাহিরজী নায়েকের স্মৃতি সৌধটি অবস্থিত। যা রামোসী উপজাতি তথা মহারাষ্ট্রের গৌরবের ইতিহাসের প্রমাণ বহন করে।

(তথ্যসূত্র: মূলত এপিক চ্যানেল-এ অনুষ্ঠিত বাহিরজী নায়েকের একটি প্রতিবেদন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা, এছাড়া কিছু ইতিহাস পাঠ্যবইয়ের সহায়তা নিয়েছি)।

Maintaining A Positive Water Balance: An Introduction

Sourin Bhattacharya

These phrases are now being heard in the media regularly: “global warming”, “melting of polar ice”, “unavailability of drinking water”, “drought occurred at a large scale” etc. Worldwide, various organizations and Governments are addressing the intense situations. Droughts essentially weaken the production of various commodities, from vegetables to inks to soft drinks to papers and more. The farmers often suffer the worst alongside the economy and common people. Very recent events include:

1. Drought in the central United States expanded its range; as a heat-wave dried the last bit of moisture left in the soils and threatening the corn and soybean plants. Iowa of Minnesota, one of the largest grain production regions, is now experiencing a very hot summer, a record in the past 60 years! This drought is expanding towards Kansas & Texas.

2. Namibian drought has hit the country’s livestock export badly and this year on two-thirds of the normal livestock export. The agricultural production is expected to decline to by at least 6% as a result of this drought, which is the most intense one in the last 30 years. The authorities roughly predict that it will take around 5 years for the fanners to recoup their losses and this drought may worsen over the course of the next 5 years or so.

3. The increasing harsh climate combined with drought has worsened the scene in Iran. People in the northern provinces of the country are experiencing a hard time in coping up with this as the tea industry, the industry which offers them the most reliable income and job security, is badly suffering from it. Reports from the Iranian Association of Tea Farmers clearly state that the “third harvest” has stopped due to poverty and drought and the competitive international market is posing as a big obstacle.

Positive water balance means the inflow of water to a system exceeds the outflow from it over a given period of time. A positive water balance is required in case of water shortages and the water can be used for irrigation & other spheres of human activity. In order to attain a positive water balance, first it is necessary to replenish the water taken from a source and then to store the surplus water. It is cardinal to maintain a positive water balance, both in homes and organizations, to mark a change which would be amplified in the near future as the world’s freshwater resource is quickly depleting, global warming doing its part and polar ice melting to engulf the earth’s rancour eyesores.

Therefore, a positive water balance should start from the grassroot level to expand

into a broader perspective and millions of litres of freshwater can be saved and utilized worldwide over a due course of time. Rainwater harvesting, community water sheds alongside collection of surplus water from agricultural fields are the principal entities in having a positive water balance in a society/region. Also, minimizing the wastage of water in daily life is equally important in the context.

Rainwater harvesting can be broadly categorized into surface runoff water harvesting and roof water harvesting. In the roof water harvesting system, the “catchment” or the roof that is intended to receive the rainwater is selected and associated with the systems, the other components of the system include a set of drainage pipes, a flushing device, filter, recharge unit and storage unit. Filtration is mainly done by sand-gravel filters, charcoal filters and sponge filters, the latter of which is very suitable for residential units. Percolation tanks are the most effective recharge units and are suitable for a large scale water harvesting system. In the surface runoff water harvesting system, similar procedures are followed but the filtration is more important as surface water is generally more contaminated than roof top water. This system is applicable to agricultural land surplus water, fresh water flooded forests and other places. Implementation of this system is very important as it would lower the risk of creating impervious surfaces, erosion and siltation. Increased runoff worsens groundwater recharge thus making droughts worse. Hortonian overland flow and Hewlettian runoff can also be minimized to a great extent and the collected water would be put into a number of industries, improving the efficiency of the production and promoting a steady water balance. Soil contaminants would not be able to get into various water bodies, thus minimizing the threat posed to aquatic organisms.

Thus, the initiation of the positive water balance is extremely important. Various NGOs and Governments are promoting rainwater harvesting and positive water balance. It would prevent floods, droughts, save aquatic organisms, help groundwater recharge and production of crops. It is the time for the common people to try this and “make the world a better and healthier place” in the future for the progeny of all of us.

Culture of Shame - Culture of A Biased Society

Jayasree Roy

It is simply torture in the name of culture!

Torture is done every single second, every single minute, and every single hour to approximately half of the population of this mighty land called India.

We are all proud to be citizens of the largest democracy of the world-a democracy which through its constitutional provisions guarantees all its citizens-justice, social, economical and political, equality of status and of opportunity. Here, we will try to figure out what these words signify to "second sex'.

Just before going into details, we will scroll through some headlines which will

manifest what "justice" and "equality" means in Indian context-

1. A woman has approached the RCF police in Chembur with a complaint that she was raped by one Hemant Patil (28) after he promised her of getting married
2. A woman residing on Dabhoi Road filed an offence with the Wadi police station after she was allegedly sexually harassed by and stabbed with a scissor
3. Three persons were acquitted for raping a photo journalist, 23in Mumbai's Shakti Mill area, who earlier raped a 19 year old in the same place.
4. Amnesty international takes serious note of the police officer for delaying investigation in the rape of a 22 year old girl on July 11.
5. The Supreme Court on Thursday granted bail to Tehelka founder Tarun Tejpal for sexually assaulting his colleague in a hotel of Goa.
6. In the recent riots in Uttar Pradesh, several Muslim women were raped. The list is endless. But relaxing at our recliner, we can never imagine why her soul and body is subjected to such brutal torture?

Since independence, India had progressed in several spheres. But still the "survival of the strongest^ law counts and from the point of psychological stigma she is labelled as "weaker sex". From birth, women are subjected to humiliation. His birth is celebrated with joy and she is filled with pain and grief. He gets best education, food and clothes and for her, the least care is expected. All is done in the name of noble culture of India!

Reflected on population basis, 35 million women are "missing" from India. In societies, where men and women are treated equally, Women tend to outnumber men. So, in India the ratio should ideally be 1020-1030 female per thousand of man. With the exception of Kerala and puduchery the ratio is less than 1. In Punjab, Rajasthan&

Haryana, this gender gap is 12% at childhood (0-2 yrs) which increases to 25% at childhood (2-6 yrs). Alarming enough to point out that this sex ratio is higher in rural areas (949) than in urban areas (929). So, apart from socio economic cause it is all about mindset, mindset of a heavily male dominated society. The artificial gender discrimination from the birth teaches a girl child that she is “paraya dhan” and her brother is “apna dhan”.

Long before bodily aggression is inflicted on her, her soul is tormented and she is taught to accept inferior position in society. In her subconscious mind certain thinking patterns are ascribed to cop up with a certain value system. She plays with dolls and utensils and are given bangles, anklets etc, thus communicating a system of fragility.

The overall impact of this obstacle to women is the ultimate inertia that halts the socioeconomic progress of the country. When half the population remains in dark, can there be light?

This gender bias also attributes to poor health status of women.

In the patriarchal society, son is considered to be the representative, successor and supporter of the father. Father considers that he will live through his son. That’s why son has the right to perform last rites of his parents. On the other hand a daughter is considered as a migratory bird that will set up her nest somewhere after marriage. She will have her gotra and surname changed. As per 66 th round of N.S.S data out of 162.83 million households in rural areas, 19.16 million (11.8%) are women headed whereas in urban areas out of 68.27 million households, 7.93 million (11.6%) are female headed.

After marriage, often not only her surname is changed, but also her first name, as if her previous identity is completely erased off. Very few of them are fortunate enough to start an independent household. Often the newly wed wife has to perform her role in front of hundred criticizing eyes. She is earlier considered a burden to her paternal home and now she is a socio economic gift to her husband. Her worth is judged not in terms of her right and dignity, but in terms of her utility to the household. Her social prestige is determiner in terms of her husband’s socioeconomic worth in the society.

A rural woman explains this very well

“Men in our families are like the sun, they have a light of their own (they have resources, are mobile, have the freedom to take decisions.) Women on the other hand are like satellites, without any light of their own. They shine, if and only if, when the sun’s light touches them. This is why have to constantly compete with each other for a bigger share of sunlight, because without the life there is no life.”

In India the definition of a married woman is simple-she will not own or inherit property except for a few regions, will not have her own home and almost certainly is man dependant. Most of the laws of the land confines men and women to their strict gender roles. They are mostly framed in colonial era when a woman's chastity is her man's property. For example the law of adultery punishes a man to commit a crime against a man in respect of his wife. Woman is subject to aggression not only by her own husband, but also by her father, brothers, uncles at their homes. Domestic violence can be defined as when one adult misuses power of relation to control another through violence and other forms of abuse.

Overall, one third of women aged 15-49 have experienced physical violence and 1 in 10 have experienced sexual aggression. In total, 35% have experienced physical or sexual violence. The picture is relatively better in north east and south, where female literacy rate, economic independence and awareness is relatively high. The picture is more dismal in respect of Muslim society due to social customs.'

In India the dowry system is a burning issue, bride's family providing valuables is to the groom and his family. If they are not satisfied the bride is ill treated, socially harassed or even murdered.

The Dowry Prohibition Act,Sec 498 A of Indian Penal Code,Sec 198 A of Criminal Procedure code are the legal teeth against domestic violence, but in India it is still the key challenge.

According to the crime clock 2005 of National Crime Records Bureau, one crime against women is reported in every 3 minutes, one molestation every 15 minutes, one rape every 29 minutes, one dowry death every 77 minutes, and one sexual harassment in every 53 minutes. It is to be kept in mind that this is the tip of the iceberg as the rate of reporting is quite microscopic due to social stigma. Indian judiciary responded accordingly, way back in 1979,in the custodial rape case the court observed that lack of consent will be presumed in such cases leading to sec 114-A to Indian Evidence Act and leading to the acquittal of constables. Victims were convicted by fast track courts on speedy basis upholding right to speedy trial enshrined in Art 21 of Indian Constitution and on "justice delayed is justice denied principle".

The gang rape of 23 year old student Jyoti Singh Pandey in the night of December 31, 2012 in a moving Delhi bus, shook every Indian woman who bears the fact that sexual harassment is a part of their daily life. In the backdrop of Nirbhaya rape case,Verma committee, constituted to frame stringent laws against rape, pointed out that

women required dignity, and respect and equal space in every sphere of life that our constitution envisaged than laws and bills to bring about equality. Women must have the ability" to insist on total equality in relationships, both with society and the state. " Let's not forget that 98% of rapists are from victim's family. In an unequal country it is hard to imagine what liberty for women means. Just omit the causes for which men fights against women, so that the gain of one's power is always weighed against the loss of the other's powers. Women are trafficked everyday by luring them of job and marriage. They are sold like cattle in the open market. In the clout of social customs like Devdasi, woman's puberty is auctioned .Laws are there, but still the practice continues. Women are treated like slave, every moment her dignity is being mocked. Working women everyday faces plight at her workspace. From the gender bias in awarding job responsibility to the sexual harassment the problem is complex.

However, after the Bishaka guideline came into force the situation has changed a bit-but I repeat only by a bit.

Feminist Gloria Steinmen suggested that we should imagine equality. But it is hard to envisage. Anybody who stands firmly on ground can only look to the sun at the sky .every day, every minute she is sinking in quick sand. To her where is the sun? Where is the sky? Even a rapist is defended on the plea that the victim's dress was provocative; her look is seductive and so on. Will she ever be able to fight back against this culture?

One day she will walk on the road, her head is held high, her mind is without fear of hunger, without fear of molestation, without fear of illiteracy, and without any fear about the future of her future girl child. We all wait for the day...

Illustrations : Mistu Dey

Illustrations : Utpala Kundu Sen

Illustrations : Ruma Dhang

Illustrations : Sourav Mitra

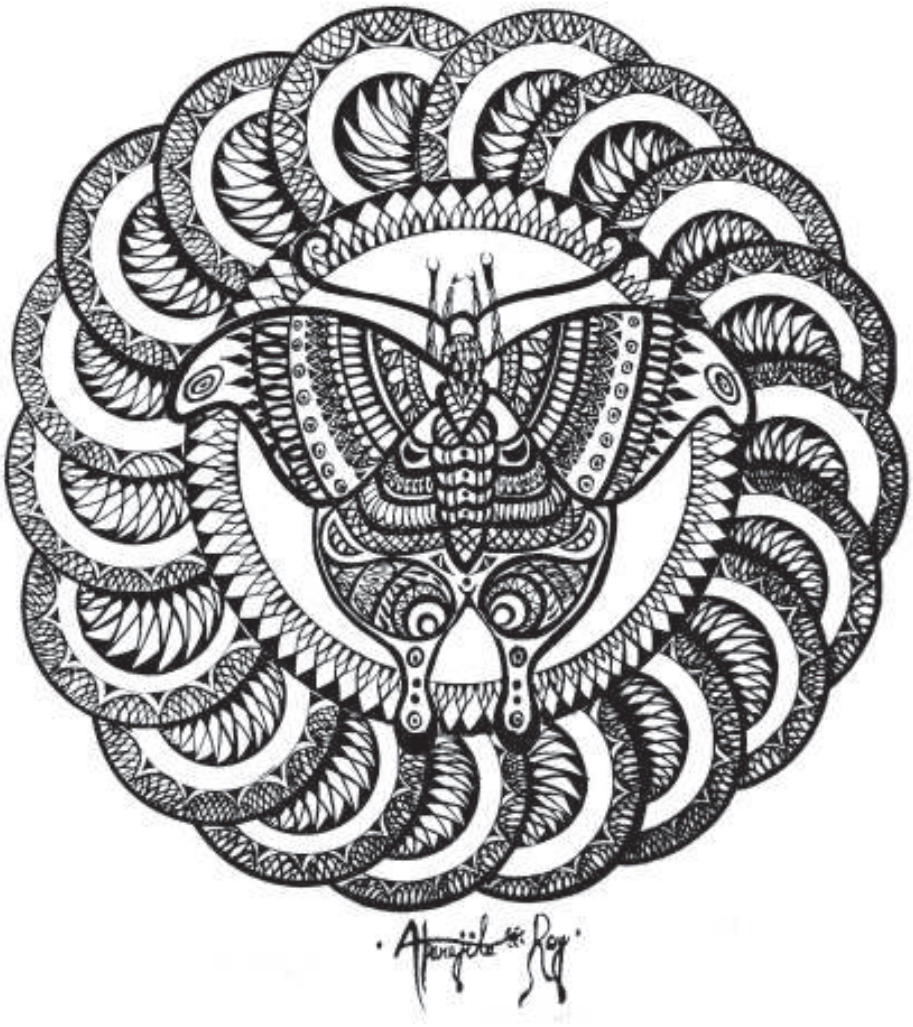

Illustrations : Aparajita Roy